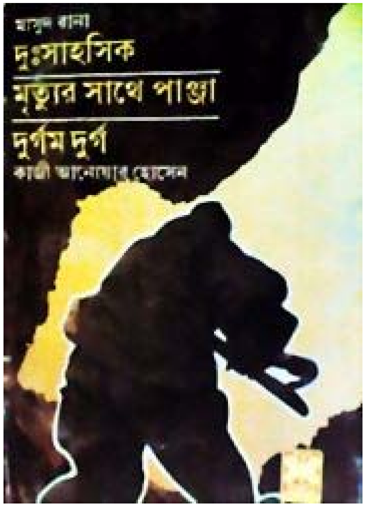

মাসুদ রানা

দুর্গম দুর্গ

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

ঢাকা থেকে করাচি। করাচি থেকে টু-সীটার সী-প্লেনে করে চলেছে রানা কেটি বন্দর।

আবোল তাবোল ভাবছে রানা। কী এমন ব্যাপার যেজন্যে এমন স্পেশাল ভাবে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? এত তাড়াহুড়োই বা কিসের? ঢাকার পি. সি. আই. হেড অফিস জানিয়েছে পাকিস্তান ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের বিশেষ অনুরোধে তাকে পাঠানো হচ্ছে করাচি। একটা অত্যন্ত জরুরী কাজে ছোট্ট একটা কম্যাণ্ডো গ্রুপকে লীড করতে হবে। আর কিছুই জানা যায়নি। অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপার। ওখানে পৌঁছে জানা যাবে সব।

করাচি পৌঁছে টি-থারটি থ্রী জেট থেকে নেমে সী-প্লেনে ওঠা ছাড়া আর তেমন কিছুই ঘটল না। একজন মাঝ-বয়সী নেভী ক্যাপ্টেন এগিয়ে এসে হ্যাণ্ডশেক করলেন রানার সঙ্গে, বিনা বাক্যব্যয়ে নিয়ে গেলেন এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে রাখা সী-প্লেনের কাছে, কয়েকটা কাগজ ধরিয়ে দিলেন ওর হাতে। আবার হ্যাণ্ডশেক করে উঠে গেল রানা সিঁড়ি বেয়ে।

কয়েকটা ডোশিয়ে। বোধহয় ওর গ্রুপের আর সবার। দেখা হওয়ার আগেই তাদের সম্পর্কে রানার যাতে মোটামুটি একটা ধারণা হয় সেজন্যে ওকে এগুলো দেয়া। সাথে প্রত্যেকের ছবি আছে একটা করে।

প্রথমেই আছে পেশোয়ারী এক ছোকরার ছবি। মাহবুব চানন্। নেভির লেফটেন্যান্ট। রেডিও এক্সপার্ট। উর্দু, পশতু, ইংরেজি এবং কচ্ছ ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে। হবি- মোটর এঞ্জিনিয়ারিং। গেরিলা ফাইটার হিসেবেও কৃতিত্ব আছে। দাড়ি গোঁফ কামানো পাতলা ছিমছাম চেহারা। চোয়ালের হাড় দুটো উঁচু। কিন্তু কম্যাণ্ডো মিশনে যাওয়ার জন্যে বয়সটা একটু কম বলে মনে হলো রানার। বাইশ কি তেইশ।

তারপর আছে পাঞ্জাবী মিশ্রী খান। প্রকাণ্ড একজোড়া কালো গোঁফ।

দেখলেই বোঝা যায় বহু ঘাটের পানি খেয়েছে। হাWিডসার মস্ত কাঠামো শরীরের। ফিফ্‌থ্‌ ডিভিশনের আর্মি ক্যাপ্টেন। বয়স পঁয়তাল্লিশ। এক্সপ্লোসিভের ব্যাপারে অদ্ভুত এক প্রতিভা। পোয়াটেক বারুদ হাতে ধরিয়ে দিলেই বোম বানিয়ে ফেলবে। কর্মঠ এবং ভয়ঙ্কর লোক।

আর তৃতীয় ছবিটা দেখে চমকে উঠল রানা। আলতাফ ব্রোহী! আর্মিতে থাকতেই পরিচয় ছিল রানার সঙ্গে। সিন্ধী। বয়স চল্লিশ বছর। করাচি পি. সি. আই.-এ কাজ করছে এখন। কয়েকটা অ্যাসাইনমেন্টে একসাথে কাজ করেছে ওরা। পরিচয়টা এখন বন্ধুত্বের পর্যায়ে চলে গেছে। প্রকাণ্ড চেহারা-যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। তেমনি করিৎকর্মা। পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ গেরিলা ফাইটার। 'রান অভ কাচে'র যুদ্ধে শত্রু লাইনের পেছনে চলে গিয়ে ভারতীয় সৈন্যদের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভাল করেই চেনে ওকে রানা। ওকে দেখলে অসম্ভব শক্তিশালী একটা যুদ্ধের মেশিন ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না রানার।

শেষ ছবিটা লেফটেন্যান্ট আরীফের। মেয়েলী চেহারা। ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের স্পাই। ওর সম্পর্কে ডোশিয়ে দেখে তেমন বিশেষ কিছু জানা গেল না।

প্রত্যেকটি লোক যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজ করেছে। এই সব এক্সপার্টদের এখান ওখান থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে একটা কম্যাণ্ডো গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু কোথায়, কি কাজে, কিভাবে নেতৃত্ব দিতে হবে জানা নেই ওর। কেটি বন্দরে পৌঁছলে হয়তো জানা যাবে। জানালা দিয়ে বাইরে চাইল মাসুদ রানা।

সিন্ধু নদের মোহনায় কেটি বন্দর। সমুদ্রের কাছাকাছি নদীর বিশাল বিস্তার। কেটি বন্দর মাইল খানেক থাকতেই নেমে পড়েছে প্লেন নদীতে। ডান ধারে তীরের ওপর কয়েকজন সামরিক পোশাক পরা লোক দাঁড়ানো। একটা তাঁবুও দেখা গেল মাঠের মধ্যে।

'দিস ইজ কমোডোর জুলফিকার অভ ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স।'

হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করল রানা। শক্ত সমর্থ শক্তিশালী একটা হাত। বয়সের ভাঁজ পড়েছে গালে। ক্লিন শেভ্‌ড্‌।

'আপনার সহকারীদের সাথে দেখা হবে পরে, তার আগে আমরা দু'চারটে কথা সেরে নিতে চাই আপনার সঙ্গে। আসুন এদিকে।'

রানার পেছন পেছন বাকি তিনজন অফিসারও এল তাঁবুর মধ্যে। সী-প্লেনটা ফেরত চলে গেল করাচি।

'দ্বারোকা যেতে হচ্ছে আপনাকে,' বললেন কমোডোর জুলফিকার একটা চেয়ারে বসে। রানাও বসল। তাঁবুর মধ্যে একটা টেবিল আর তার চারপাশে ক'টা চেয়ার ছাড়া আসবাব নেই আর। কমোডোরের টেম্পোরারী অফিস।

স্থির দৃষ্টিতে রানার দিকে চেয়ে আবার আরম্ভ করলেন কমোডোর, 'করাচি থেকে দুশ দশ মাইল দূরের এই নৌ-ঘাঁটিটা বরাবর আমাদের মাথা-ব্যথার কারণ। অত্যন্ত শক্তিশালী রাডারে ওরা ওখানে বসে করাচিতে পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের গতিবিধি লক্ষ করছে এবং চারদিকে ইনফরমেশন দিচ্ছে। ওদের এয়ার ফিল্ড থেকে উঠে ভারতীয় বিমান বাহিনী করাচিতে বম্বিং করবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার ওপর ওখানে জমা হচ্ছে ওদের নৌবাহিনী-অতর্কিত আক্রমণে পাকিস্তান ন্যাভাল ফোর্সকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়ার জন্যে। কাজেই স্ট্র্যাটেজিক পজিশনে অবস্থিত এই নৌ-ঘাঁটি ধ্বংস করে দেয়া ছাড়া আর কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছি না আমরা। দেরি হলেই হার হয়ে যাবে আমাদের।'

'আমরা পাঁচজন গিয়ে...'

'আপনাদের কাজ কেবল ওদের দুর্গম দুর্গে প্রবেশ করে চারটে অব্যর্থ কামান ধ্বংস করে দেয়া। ওগুলোর জন্যে দ্বারোকার আধমাইলের মধ্যে যাওয়া যাচ্ছে না। ওগুলোকে স্তব্ধ করে দিতে পারলে বাকি কাজ নির্বিঘ্নে সেরে আসতে পারবে পাকিস্তান নেভি। একাজের জন্যে শ্রেষ্ঠ যোগ্যতাসম্পন্ন তিনজন সহকারী পাচ্ছেন আপনি, দ্বারোকা পৌঁছে লেফটেন্যান্ট আরীফের সাহায্য পাচ্ছেন, কাজেই আমরা আশা করতে পারি সফল হতে পারবেন আপনি। গোটা দেশের নিরাপত্তা নির্ভর করছে এই কম্যাণ্ডো গ্রুপের নেতার ওপর, তাই আপনাকে বেছে নিয়েছি আমরা। আশা করি এই সম্মানের মর্যাদা রক্ষা করবেন।'

'চেষ্টার ত্রুটি হবে না, স্যার,' বলল রানা বিনীত ভাবে।

এবার ম্যাপ বের করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রত্যেকটি ব্যাপার আলোচনা করলেন কমোডোর। রানা অবাক হলো ভদ্রলোকের নিপুণ প্ল্যানিং এবং পরিচ্ছন্ন চিন্তা দেখে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারও দৃষ্টি এড়ায়নি ওঁর। দুই ঘণ্টা কখন পার হয়ে গেল বুঝতেই পারল না সে। কমোডোর জুলফিকারের প্রতিটি কথা স্রেফ হাঁ করে গিলে নিল মাসুদ রানা। পুরো প্ল্যানটা ভালভাবে বসিয়ে নিল মাথার মধ্যে।

'উইশ ইউ বেস্ট অভ লাক, ইয়ংম্যান।' রানার কাঁধের ওপর রাখলেন কমোডোর ডান হাত। 'কাজটা ভয়ঙ্কর, দুঃসাধ্য এবং বিপদজনক। কিন্তু শুনেছি, কারও পক্ষে যদি সম্ভব হয় এ মিশন সফল করা, সে হচ্ছেন আপনি। আমার বিশ্বাস, আপনি পারবেন।'

মাইল খানেক তফাতে একটা ডাক-বাংলো প্যাটার্নের কাঠের বাড়িতে নিয়ে আসা হলো রানাকে জীপে করে। পাঁচ মাইল দূরে আরব সাগরের বুকে ঝিলিমিলি এঁকে ডুবে যাচ্ছে সূর্যটা। চারদিকে কুয়াশা-কুয়াশা ধোঁয়াটে ভাব। উনিশশো পঁয়ষট্টি সালের সেপ্টেম্বর মাস। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ঢুকে পড়ল

রানা বাড়ির ভেতর কমোডোর জুলফিকারের পেছন পেছন।

সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে চলে গেলেন কমোডোর। এখন সব কিছুর ভার রানার ওপর। লেফটেন্যান্ট আরীফের সঙ্গে তার নিজেকেই পরিচয় করে নিতে হবে দ্বারোকায়।

টেবিলে খাবার সাজানো রয়েছে। খাওয়া শেষ করে ওদের যেটুকু বলা দরকার বলবে রানা। তারপর নৌকোয় উঠে বাকি কথা হবে। আধঘণ্টার মধ্যে রওনা হতে হবে ওদেরকে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ একমনে খেল রানা। বুঝতে পারল আলতাফ ছাড়া আর সবাই লক্ষ করছে তাদের নতুন দলপতিকে। বুঝবার চেষ্টা করছে, মূল্যায়নের চেষ্টা করছে চোখে দেখে যতটুকু সম্ভব। এমন সময় ঘরে এসে ঢুকল একজন অপরিচিত সামরিক অফিসার। কাঁধের ওপর তিনটে স্টার দেখে বোঝা গেল আর্মি ক্যাপ্টেন, সদ্য প্রমোশন পেয়েছে। ফর্সা চেহারা, চাল চলনে একটা উদ্ধত ভাব। দেখেই আন্দাজ করা যায়, সেপাইদের যম।

'কি ব্যাপার? এখনও খাওয়াই হয়নি আপনাদের? অথচ আপনাদের এই কোয়ার্টার ভ্যাকেট করবার কথা ছিল ছ'টার সময়। আমাকে আমার কোয়ার্টার থেকে বের করে দিয়ে যদি এ রকম অত্যাচার…'

'আপনাকে চিনলাম না,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা। লোকটার গলাটা খোনা, আর ব্যবহারে এমন একটা বিরক্ত বেপরোয়া তাচ্ছিল্যের ভাব রয়েছে যে দেখেই পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল রানার।

ঝট্ করে ফিরল অফিসার রানার দিকে। 'ও, আপনি বুঝি নতুন এসেছেন? তা আপনি কে শুনি?'

'গেট আউট!' আঙুল দিয়ে দরজা দেখিয়ে দিল রানা। 'আমরা যতক্ষণ আছি কোন পঞ্চম ব্যক্তি চাই না। বেয়ারাকে পর্যন্ত ওই গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হুকুম দিয়েছি। আপনি এখন যেতে পারেন।'

'কি? আমার বাড়িতে বসে আমাকে গেট আউট?' কট্মট্ করে চেয়ে রইল ক্যাপ্টেন রানার দিকে। রাগে লাল হয়ে গেছে সারা মুখ। আবার হাতের ইশারায় দূর হয়ে যেতে বলল ওকে রানা। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল সে ঘর ছেড়ে।

'আজ আমরা কেন সমবেত হয়েছি জানার জন্যে নিশ্চয়ই আপনারা সবাই উৎসুক হয়ে আছেন। আমরা কেউ কাউকে চিনি না, পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের টেনে আনা হয়েছে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে। শত প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে সবার মনে। আমি আপনাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি একে একে। সম্মিলিত চেষ্টায় আমাদেরকে একটা অসাধ্য সাধন করতে হবে। খুলে বলছি, শুনুন…'

'গেছি রে গেছি, বাবা, নির্ঘাত মারা পড়েছি!' ককিয়ে উঠল মিশ্রী খান। 'এই

সেপ্টেম্বরের তুফানের দিনে সামুন্দার? নৌকায়? উহ্!' ফস্ করে দেশলাই জ্বেলে কিংস্টর্ক সিগারেট ধরাল সে একটা।

'ক্যাপ্টেন খান ঠিকই বলেছেন,' বলল মাহবুব চানন্। 'মস্ত বড় ঝুঁকি নিচ্ছেন আপনি, মেজর রানা। হুকুম করলে আমি নেভিগেট করব, কিন্তু পৌঁছতে পারব কিনা তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

'ঝুঁকিটা আমাদের নিতেই হবে। অন্য কোনও পথে আমাদের বিপদ আরও বেশি। আলতাফ, তুমি কোথায় চললে?' কথাটা শেষ হবার আগেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল আলতাফ ব্রোহী। দেখা দেখি তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মিশ্রী খান। হাতে একটা পিস্তল।

'মাহবুব, পাশের ঘর থেকে টর্চটা নিয়ে এসো। কুইক!' বলে রানাও এক লাফে বেরিয়ে এল বাইরে।

কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। আগেই টের পেয়ে গিয়েছিল, টর্চ আনতে আনতে বেড়া টপকে একশো গজ দৌড়ে চলে গেছে সে। দুটো গুলি ছুঁড়ল মিশ্রী খান- লাগল না একটাও। বেয়ারা দৌড়ে এগিয়ে এল। আলতাফকে দেখা গেল না কোথাও।

'লোকটাকে চেনো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'চিনি, হুজুর! ক্যাপ্টেন সাহেবের খানসামা, করিম। বোবা আর কালা।'

'বোবা-কালা যদি হবে তো লুকিয়ে লুকিয়ে কি শুনছিল সে কান পেতে?'

কোনও জবাব দিল না বেয়ারা। ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল ওদের দিকে।

'কোথায় গেছে তোমার ক্যাপ্টেন সাহেব?'

'অফিসারস্ ক্লাবে।'

'ডেকে আনো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসতে বলবে।'

বেয়ারা চলে যেতেই ফিরে এল ওরা ডাইনিং রুমে। একটা ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়ল মিশ্রী খান। বলল, 'ওকে ধরা না গেলে আমাদের রওনা হওয়ার কোনও মানে হয় না, ওস্তাদ। ব্যাটা স্পাই। আমার কোনও সন্দেহ নাই।'

গম্ভীর মুখে পায়চারি করল রানা কিছুক্ষণ। আবার চেয়ারে এসে বসে অপেক্ষা করছে আলতাফের। এমনি সময় হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল একটা মিশমিশে কালো লোক। গেঞ্জি আর হাফ প্যান্ট পরনে। পেছনে ওর একটা হাত মুচড়ে ধরে ঢুকল আলতাফ ব্রোহী। অপর হাতে একটা ছোরা।

'ব্যাটা ছোরা তুলেছিল! ওর কব্জিটা ভেঙেই ফেলেছি কিনা জানি না,' বলল আলতাফ।

'কি নাম তোমার?' জিজ্ঞেস করল রানা লোকটাকে। 'কি করছিলে তুমি এখানে?'

কোনও জবাব দিল না লোকটা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। খটাং করে মাথার পেছনে আলতাফের হাতের এক গাঁট্টা পড়তেই ককিয়ে উঠল।

তারপর 'আঁউ-আঁউ' করে বোবার মত বিকট শব্দ বের করল মুখ থেকে।

'তোমাকে একটা প্রশ্ন করা হয়েছে, তার উত্তর দাও। তোমার অভিনয় দেখতে চাওয়া হয়নি।' উঠে বসল মিশ্রী খান। ধীরে সুস্থে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সে একটা সাইলেন্সার লাগাচ্ছে ওর পিস্তলের মুখে।

আবার খানিকক্ষণ বিকট আওয়াজ বের করল সে মুখ দিয়ে। ওর পেছন দিকে কানের কাছে একটা শব্দ করল আলতাফ তুড়ি দিয়ে, কিন্তু যেন শুনতেই পায়নি এমন ভাবে সামনের দিকে চেয়ে রইল লোকটা। মাহবুবের মনে হলো নিশ্চয়ই লোকটা বোবা এবং কালা। বলেই ফেলল, 'লোকটা সত্যি বোবা-কালা।'

'হতে পারে, না-ও হতে পারে,' বলল রানা। 'কিন্তু ও যে আড়ি পেতেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাছাড়া নিরপরাধ লোক এমন হঠাৎ ছোরাই বা বের করবে কেন? কাজেই আমরা যে বিরাট কাজে হাত দিয়েছি তাতে ঝুঁকি নেয়া চলবে না।' হঠাৎ নিষ্ঠুর নির্দয় হয়ে উঠল রানার কণ্ঠস্বর, 'আলতাফ!'

'বলো, মেজর।'

'ছুরি তো আছেই। ঝটপট কাজ সেরে ফেল। ঠিক হৃৎপিণ্ড আন্দাজ করে চালাবে।'

একটা আতঙ্কিত চিৎকার বেরিয়ে এল মাহবুবের মুখ থেকে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। দড়াম করে উল্টে গেল চেয়ারটা। 'কি করছেন, মেজর...'

মুখের কথা বেধে গেল মাহবুবের। অবাক হয়ে দেখল ছুটে গিয়ে ধাক্কা খেল লোকটা কাঠের দেয়ালে। প্রাণভয়ে একটা হাত তুলে রেখেছে সে ওপরে। ঘরের কোণের দিকে সরে যাচ্ছে সে গুটিসুটি মেরে। সারা মুখে আতঙ্কের স্পষ্ট ছাপ। চোখ ফিরিয়ে দেখল বিজয়ীর হাসি আলতাফের মুখে, মিশ্রী খানও বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। হঠাৎ নিজেকে আস্ত গর্দভ মনে হলো ওর। স্বভাবতই বেশি কথা বলে মিশ্রী খান। হা-হা করে হেসে উঠে বলল, 'বোবা কালারও জানের ভয় আছে, বাবা। ভাল কায়দা করেছেন, ওস্তাদ।'

এমনি সময় ঘরে ঢুকল ক্যাপ্টেন বেয়ারার সাথে। ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে। আক্রমণাত্মক ভঙ্গি। ঢুকেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'কি পেয়েছেন আমাকে, মি. মাসুদ রানা? যখন-তখন ডেকে পাঠাবার আপনি কে? ঘরটা আবর্জনামুক্ত হলো কিনা দেখতে এসেছি। আপনার কথা শুনতে আসিনি।'

'এই লোকটা কে?' কোণের দিকে ইঙ্গিত করল রানা।

কোণের দিকে চেয়েই মুখের ভাব পাল্টে গেল ক্যাপ্টেনের। 'আরে! করিম! আমার খানসামা। ও ওখানে কেন?'

'দেয়ালে কান ঠেকিয়ে বাইরে থেকে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'খবরদার, ক্যাপ্টেন!' মিশ্রী খানের পিস্তলটা ক্যাপ্টেনের দিকে ধরা।

'আমরা সবাই দেখেছি। ও কি আপনার স্পাই না ভারতের, কেবল তাই জানতে চাই আমরা।'

অবাক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ক্যাপ্টেন মিশ্রী খানের পিস্তলের দিকে। জোর করে হাসবার চেষ্টা করল সে। লাল হয়ে উঠল ওর ফর্সা মুখ। বলল, 'বিশ্বাস করি না, তার কারণ লোকটা বোবা ও কালা।'

'বোবা কিনা জানি না,' বলল রানা। 'কিন্তু কালা যে নয় তার প্রমাণ আছে আমাদের কাছে।' একটা হাত তুলে ক্যাপ্টেনকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনার সাথে এ ব্যাপারে তর্কাতর্কি করবার সময় আমাদের নেই। লোকটাকে এক্ষুণি অ্যারেস্ট করুন এবং অন্ততপক্ষে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে যেন সে কারও সঙ্গে কথা বলতে বা দেখা করতে না পারে সেজন্যে নির্জন সেলে আটকে রাখুন। কথা বলতে পারুক আর না পারুক, লোকটা ভয়ঙ্কর।'

'চমৎকার, চমৎকার!' তিক্ত হাসি হাসল ক্যাপ্টেন। 'একজন সিভিলিয়ানের হুকুম তামিল করতে হবে আমাকে। কোথাকার মাতব্বর এসেছেন আপনি...'

রানাকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দেখে থেমে গেল সে। টেবিলটা ঘুরে হেঁটে এসে ক্যাপ্টেনের এক ফুট দূরে থামল রানা। কঠোর দৃষ্টি ওর চোখে।

'আপনার এই ব্যবহারের জন্যে ইচ্ছে করলেই কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারতাম- কিন্তু তা করব না। সময় নেই আমাদের হাতে। যা বলছি তাই করবেন আপনি, নইলে ডিমোশন তো হবেই, কোর্ট মার্শালও হতে পারে। কি? কর্নেলের সাথে দেখা করতে হবে, না আমার হুকুম তামিল করবেন?'

বেত্রাহত কুকুরের মত কুঁকড়ে গেল ক্যাপ্টেন। বুঝল, মুখে যা বলছে কাজেও সেটা করে দেখাবার ক্ষমতা আছে এই লোকের। সবার সামনে এই চরম অপমান আর পরাজয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকল সে বাঁশপাতার মত। কিন্তু অল্পক্ষণেই সামলে নিল নিজেকে।

'ঠিক আছে। ঠিক আছে। অত সব ভয় না দেখালেও চলত। যা বলছেন তাই হবে। জানি, বেহুদা আপনার সন্দেহ, তবু...। বেয়ারা, দু'জন গার্ড ডেকে নিয়ে এসো।'

'আপনার অপমানিত বোধ করবার কিছুই নেই, ক্যাপ্টেন,' চট করে বলল মিশ্রী খান। 'যাঁর হুকুম পালন করতে যাচ্ছেন তিনি বর্তমানে সিভিলিয়ান হলেও আর্মিতে আপনার চেয়ে এক র‍্যাঙ্ক ওপরে ছিলেন।'

দুই

আধঘণ্টার মধ্যে জিনিসপত্র সব নৌকোয় তুলে তৈরি হয়ে নিল ওরা। কমোডোরের পার্সোনাল পিক্-আপে মালপত্রসহ ওদের সমুদ্রের ধারে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। নৌকার চার্জে যে গার্ডটা ছিল তাকে তুলে নিয়ে ফিরে গেছে পিক্-আপ।

গয়না-নৌকোর সমান বহুদিনের পুরানো একটা জেলে নৌকা। এখানে-ওখানে কাঠ দিয়ে তালি মারা। পাটাতনের নিচেই এঞ্জিনরুম। এঞ্জিনের অবস্থাও নৌকার মতই।

নৌকার মধ্যে ওদের জন্যে পুরানো নোংরা কাপড়, খাবার, একটা স্টোভ, রশি, রিসিভারসহ একখানা রেডিয়ো ট্র্যান্সমিটার, দুটো বেরেটো সাব-মেশিনগান, দুটো মাউজার ব্রেনগান, তাছাড়া আয়না, টর্চ ইত্যাদি টুকিটাকি জিনিস আগে থেকেই রাখা আছে। পিক্-আপ থেকে নামানো হয়েছে দুটো বাক্স। একটায় টিএনটি, অ্যামাটোল, ডিনামাইট স্টিক, গান কটন প্রাইমার, এমারি ডাস্ট, গ্রাউণ্ড গ্লাস আর একটা জারে করে পটাশিয়াম আছে। অন্যটার মধ্যে আছে ডিটোনেটার। পারকাশন আর ইলেকট্রিক দু'রকমই।

এঞ্জিন রুমের মধ্যে থেকে বাইরে মাথা বের করল মাহবুব। মাস্তুলটার দিকে চেয়ে বলল, স্পাল আছে না, স্যার, সঙ্গে?'

'আছে বোধহয়, কেন?'

'কারণ আমি হলপ করে বলতে পারি, দরকার হবে।'

'কেন, এঞ্জিন?'

'ওটা "এন"-ও নয় "জিন"-ও নয়। ঠাকুরদার আমলের একটা টু সিলিণ্ডার ভটভটি। প্রপেলার শ্যাফটের সাথে যে জায়গাটা মিশেছে ওখানে দুই মণ রাস্ট পড়ে আছে। এ জিনিসের ওপর নির্ভর করলে আর পৌঁছতে হবে না আমাদের।'

রানা বুঝল এই এঞ্জিন পেয়ে ভেতর ভেতর যার-পর-নাই খুশি হয়ে উঠেছে মাহবুব। ওর কারিগরী মাথা খেলাবার সুযোগ পেয়েছে সে এইবার। কিন্তু এ ধরনের একটা নৌকায় ওদের এত গুরুত্বপূর্ণ কাজে পাঠানো হচ্ছে বলে মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট না হয়ে পারল না সে।

ছেড়ে দিল নৌকা। সোজা এগোল ওরা দক্ষিণে। দ্বারোকা আর ওখা-র মাঝামাঝি পাহাড়ী জায়গায় উঠবে। আধঘণ্টার মধ্যেই সামরিক পোশাক খুলে জেলে পোশাক পরে নিল ওরা। সাগরে ডুবিয়ে দেয়া হলো পাকিস্তানী পোশাকগুলো পাথর বেঁধে। প্রকাণ্ড গোঁফে বার কয়েক তা দিয়ে পাটাতনের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল মিশ্রী খান। পালা করে রাত জাগতে হবে। প্রথমে জাগবে আলতাফ আর মাহবুব।

রানা শুয়ে পড়ল মিশ্রী খানের পাশে। এঞ্জিনের শব্দ আর সাগরের কুলুকুলু। বাতাস নেই। নিস্তরঙ্গ আরব সাগরে ভেসে চলেছে ওরা অজানার উদ্দেশে।

'ওস্তাদ!' কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে নিচু গলায় ডাকল মিশ্রী খান।

'কি?'

'আমার অবশ্য মাথা ঘামানো উচিত না, তবু জিজ্ঞেস করছি, যদি ওই ছোকরা ক্যাপ্টেন আপনার হুকুম না শুনত, তাহলে কি করতেন আপনি?'

'কর্নেলকে বলতাম। কর্নেল না শুনলে গুলি করে মেরে ফেলতাম করিমকে।'

'আমিও ঠিক তাই ভেবেছিলাম। আচ্ছা, ক্যাপ্টেন যদি আপনার কথা না শুনত তাহলে কি ওর কোর্ট মার্শাল হত সত্যি করে?'

'না। আমাদের হাতে অত ক্ষমতা নেই। এমনি ভয় দেখিয়েছিলাম। ধমকেই কাজ হয়ে গেল- কাজেই ওসব কথা ভাবার কোনও দরকার নেই।' ঘুমে জড়িয়ে এল রানার কথাগুলো।

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। আসলে আমাদের হাতে অত ক্ষমতা নেই। কিন্তু কেন জানি আমার মনে হচ্ছে করিমকে মেরে রেখে আসাই উচিত ছিল। ওই ক্যাপ্টেনটার মুখের চেহারা দেখেছিলেন? আপনি দেখতে পাননি, আমি দেখেছি। আপনি যখন ওর দিকে পেছন ফিরলেন তখন কেউ উপস্থিত না থাকলে আপনার পিঠে ছুরি বসিয়ে দিতেও দ্বিধা করত না ও। ওর অহঙ্কার গুঁড়ো হয়ে গেছে, ওস্তাদ। অস্তুরী লোকের কাছে এর চাইতে বড় অপমান আর কিছুই নেই।'

রানার তরফ থেকে জবাব এল না কোনও। গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছে সে। পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল মিশ্রী খানও। কিন্তু মন থেকে অস্বস্তি গেল না ওর।

ঠিক ভোর ছ'টার সময় বন্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন। ছুটে গেল রানা এঞ্জিন রুমের দিকে। ঘুম ভেঙে উঠে বসল আলতাফ আর মিশ্রী খান। মাহবুব ঘুমাতে অস্বীকার করায় মিশ্রী খানকে আর ওঠানো হয়নি।

'কি হলো, ওস্তাদ? পৌঁছে গেছি?'

জবাব দিল মাহবুব। মাথা বের করল সে এঞ্জিন রুমের ভেতর থেকে।

'প্রায়। তিনভাগের দুই ভাগ চলে এসেছি। বাকিটা পাল টাঙিয়ে যেতে হবে। এক্জস্ট লিক।'

'মেরামত হবে না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'অসম্ভব। ওয়েলডিং দরকার। হাবিজাবির মধ্যে একটা স্পেয়ার এঞ্জিন খুঁজে পাওয়া গেছে, দেখি চেষ্টা করে লাগানো যায় কিনা।'

'কতক্ষণ লাগবে, মাহবুব?'

'ঠিক বলতে পারছি না, স্যার। আদৌ হবে কিনা তা-ও বলা যায় না। একদম রাস্ট পড়ে আছে। আপনি পালটা ওঠাবার ব্যবস্থা করুন, আমি চার্ট দেখে হাল অ্যাডজাস্ট করে দিয়ে লাগব এঞ্জিনের পেছনে।'

মাথার ওপর দিয়ে দুটো মিগজেট উড়ে চলে গেল। কিছুদূর গিয়ে কি মনে করে ঘুরে এল আবার। ডাইভ দিয়ে অনেক নিচে নেমে দেখল ওদের- তারপর সন্তুষ্ট চিত্তে চলে গেল যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকেই।

পাল তুলে দেয়া হলো নৌকায়। বেশ ফর্সা হয়ে গেছে চারপাশ। মিশ্রী খান নেমে গেল মাহবুবের সাথে এঞ্জিনরুমে, সাহায্য করবে বলে। বড় সাইজের একটা মশুরির ডালের মত সূর্য উঠল পুব সমুদ্র থেকে।

দুই ঘণ্টা পার হয়ে গেল। মন্থর গতিতে চলেছে নৌকা গন্তব্যস্থলের দিকে। হঠাৎ পেছন দিকে চেয়েই চিৎকার করে উঠল রানা।

'দেখেছ, আলতাফ?'

'দেখেছি, মেজর। এখনও তিন মাইল আছে। ঘণ্টাখানেক আগে যেটা পাশ কাটিয়ে চলে গেল, খুব সম্ভব সেটাই। ওদের টহলদারী লঞ্চ।'

'সোজা আসছে আমাদের দিকে! মিশ্রী আর মাহবুবকে শিগগির ডাকো।'

জরুরী বৈঠক বসল।

'আমাদের থামিয়ে সার্চ করবে ওরা। কিছু একটা সন্দেহ করেছে নিশ্চয়ই। কিংবা কোন সংবাদ জানতে পেরেছে, তাই ফিরে আসছে। বিপদ আশা করবে ওরা, এবং সাবধান থাকবে। কাজেই মাঝামাঝি কোনও ব্যবস্থা চলবে না। হয় ওরা ডুববে, নয় আমরা- এছাড়া আর কোনও উপায় নেই। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র আমরা কিছুতেই পানিতে ফেলব না। কাজেই, সার্চ করলে সব বেরিয়ে পড়বে।'

খুব দ্রুত প্ল্যান ঠিক করে সবাইকে বুঝিয়ে দিল রানা। সব চাইতে অনভিজ্ঞ মাহবুব। জীবনে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ায়নি সে কখনও আগে। যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা হয়নি ওর। হঠাৎ বলে উঠল, 'অসম্ভব! আপনি যা করতে যাচ্ছেন সেটা মানুষ খুন। এভাবে হত্যা করবার কোনও অধিকার…'

'খবরদার!' চিৎকার করে উঠল মিশ্রী খান। 'তুমি দুধের বাচ্চা, তুমি কি বোঝ? চুপ করে থাকো।'

'হয়েছে, মিশ্রী খান!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল রানা। কয়েক সেকেণ্ড তীব্র দৃষ্টিতে ওর দিকে বিরক্তি বর্ষণ করে ফিরল মাহবুবের দিকে। 'লেফটেন্যান্ট, এটা যুদ্ধ। আর যুদ্ধের নিয়মই হচ্ছে শত্রুপক্ষকে সমান সুযোগ না দিয়ে কোনও না কোনও অসুবিধার মধ্যে রাখা। কারণ আমরা যদি ওদের মারতে না পারি, ওরা আমাদের মারবে। এটা অত্যন্ত সহজ যুক্তি- হয় ওরা তলিয়ে যাবে, নয় আমরা। আমাদের মিশনের উদ্দেশ্য হাজার হাজার পাকিস্তানী সৈনিকের প্রাণ রক্ষা করা, বিশ্বের চোখে আমাদের যোগ্যতা তুলে ধরা।

এখন এই মুহূর্তে বিবেকের প্রশ্নই ওঠে না।'

মাথা নিচু করে রইল মাহবুব। রানার যুক্তির অকাট্যতা হৃদয়ঙ্গম করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই যে হত্যাকাণ্ড ওর নিজ চোখে দেখতে হবে সেটা কল্পনা করে শিউরে উঠল একবার। বুঝল, রানাকে বিচার করবার ক্ষমতা এখনও হয়নি ওর। বলল, 'আমাকে মাফ করবেন, মেজর। ক্যাপ্টেন খান ঠিকই বলেছেন, আপনাদের তুলনায় আমি দুধের বাচ্চা ছাড়া কিছুই নই। আমার চুপ করে থাকাই উচিত।' একবার ফিরে চাইল সে মোটর লঞ্চটার দিকে। 'আমার ওপর নির্ভর করতে পারেন, স্যার।'

'বেশ, বেশ,' মৃদু হাসল রানা মাহবুবের দিকে চেয়ে। 'তোমার ওপর নির্ভর করতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। এছাড়া অবশ্য উপায়ও নেই- আলতাফ আর তুমি ছাড়া কচ্ছ ভাষা আর কেউ জানে না। কিন্তু সেজন্যে নয়। আমাদের এই ছোট্ট গ্রুপের প্রত্যেকের ওপর প্রত্যেকে নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে না পারলে সাফল্য আসবে না। মিশ্রী খান, জিনিসটা রেডি করো। স্বাভাবিক, সহজভাবে চলাফেরা করবে। ওদের দূরবীন এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে আমাদের।'

সামনের দিকে হেঁটে চলে এল রানা। আলতাফ এল পিছু পিছু। এঞ্জিন সারতে বসল মাহবুব। মিশ্রী খান ব্যস্ত হয়ে পড়ল একটা বিশ্রী কাজে।

লঞ্চটা যখন ছয়ফুট দূরে এসে পড়ল তখন পাটাতনে বসে একটা ছেঁড়া চাদর কোলের ওপর বিছিয়ে সেলাই করছে রানা। জনা ছয়েক ভারতীয় ন্যাভাল অফিসার দেখা গেল রেলিং-এর ধারে। তিনজনের হাতে অটোমেটিক কারবাইন, দু'জনের হাতে রিভলভার। একধারে ট্রাইপডের ওপর বসানো একটা মেশিনগান চেয়ে আছে ওদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে। হুইল-হাউস থেকে মাথা বের করল অল্প বয়সী এক লেফটেন্যান্ট। দুই হাত মুখের কাছে তুলে চিৎকার করে বলল, স্পাল নামাও।'

মনেমনে চমকে উঠল রানা। হিম হয়ে গেল বুকের ভেতরটা। কথাটা পশতু ভাষায় বলেছে লেফটেন্যান্ট। মাহবুব একে ছেলেমানুষ, তার ওপর অনভিজ্ঞ। ঠিক ধরা পড়ে যাবে। রানা পরিষ্কার বুঝল, এই প্রথম কথাতেই ধরা পড়ে যাবে ওরা।

কিন্তু মাহবুব এই ফাঁদে পা দিল না। মাথাটা কাত করে কানের কাছে হাত তুলে হাঁ করে কিছু শুনবার চেষ্টা করল। ঠিক মাথা মোটা জেলেদের চমৎকার অনুকরণ। কথাটা যেন বুঝতেই পারেনি এমন ভাবে কচ্ছ ভাষায় জিজ্ঞেস করল, 'কি বলছেন গো?'

স্পাল নামাও। তোমাদের নৌকা সার্চ করব।' রানা লক্ষ করল এবারেও পশতু ব্যবহার করছে লেফটেন্যান্ট।

বোকার মত চেয়ে রইল মাহবুব ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ, তারপর রানা এবং আলতাফের দিকে চাইল অসহায় দৃষ্টিতে। ওদের চেহারা দেখেও বোঝা

গেল একটি বর্ণও বুঝতে পারেনি ওরা। হতাশ ভাবে দুই হাতের তালু চিৎ করল সে।

'মাদ্রাজী ভাষা আমরা বুঝি না,' চিৎকার করে বলল সে। 'কচ্ছের ভাষা বলতে পারেন না?'

এক বিশেষ ধরনের মুখভঙ্গি করল লেফটেন্যান্ট। ভাঙা-ভাঙা কচ্ছ ভাষায় বলল, 'এক্ষুণি নৌকা থামাও, আমরা সার্চ করব।'

'কি? নৌকা থামাব? কেন নৌকা থামাব, কিসের সার্চ? আমরা চোর, না ডাকাত? লাইসেন্স আছে আমাদের…' খেপে উঠল যেন মাহবুব। হাত-পা ছুঁড়ে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বাধা দিল লেফটেন্যান্ট।

'দশ সেকেণ্ড সময় দিলাম। তারপর গুলি করব।'

আহত-পরাজিত মাহবুবের মুখের চেহারা। তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'নামাও পাল।'

পাল নামিয়ে ফেলল আলতাফ। নামিয়ে বোকার মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। খালি দুই হাত ঝুলছে দেহের দুই পাশে। রানাও সেলাই বন্ধ করে বিরক্ত মুখে চেয়ে রইল লঞ্চের অফিসারদের দিকে। ডিজেল এঞ্জিনের শব্দটা একটু গভীর হলো। কাছে সরে এসে নৌকার গায়ে গা ঠেকাল লঞ্চটা।

রিভলভার আর অটোমেটিক কারবাইন হাতে নেমে এল তিনজন অফিসার মেশিনগানের লাইন অফ ফায়ার থেকে গা বাঁচিয়ে। ঝট করে প্রথম জন সরে এল মাস্তুলের কাছে। ঘুরে দাঁড়িয়েই রানা ছাড়া বাকি সবাইকে কন্ট্রোলে রাখার জন্যে রিভলভারের মুখটা বুলিয়ে নিল ওদের ওপর। রানাকে লঞ্চের স্প্যানডাও মেশিনগানটার হাতেই ছেড়ে দিল সে।

মাথা ঘুরিয়ে নির্বোধ দৃষ্টিতে চারদিকে চাইল রানা। মাহবুব ডেকের ওপর সাইলেন্সার মেরামতের কাজে লেগেছে। মিশ্রী খান ওর থেকে দেড় গজ দূরে কাতানি দিয়ে একটা টিন কাটছে মনোযোগের সঙ্গে- মেরামতের কাজে লাগবে। রানা লক্ষ করল কাতানিটা বাম হাতে ধরেছে মিশ্রী খান। অর্থাৎ, ডান হাতটা মুক্ত আছে রানার আদেশের অপেক্ষায়। আলতাফ তেমনি দাঁড়িয়ে আছে বোকার মত। মাস্তুলের কাছে দাঁড়ানো লোকটা নিষ্পলক চোখে চেয়ে রয়েছে সবার দিকে। বাকি দুজন ধীর পায়ে হেঁটে আলতাফের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, কারবাইন দুটো ঢিল করে ধরা। সমস্ত নৌকাটা যে ওদের আয়ত্তে এসে গেছে, তাতে ওদের কোন সন্দেহ নেই। গোলমালের কথা ভাবাও এখন হাস্যকর।

ঠিক এই সময় চাদরের তলা থেকে ঠাণ্ডা মাথায় সযত্নে প্রথম গুলিটা করল রানা। সোজা গুলি গিয়ে লাগল স্প্যানডাও মেশিনগানারের হৃৎপিণ্ডে। পর মুহূর্তে ঢলে পড়ল মাস্তুলের পাশে দাঁড়ানো অফিসারটা রানার দ্বিতীয় গুলিতে। অফিসারটা ডেকের ওপর গড়িয়ে পড়বার আগেই তিনটে জিনিস ঘটল একই সঙ্গে। ঝট্ করে বল-সাইলেন্সারের পাশে লুকানো মিশ্রী খানের

পিস্তলটা তুলেই পরপর চারটে গুলি করল মাহবুব। কাতানি দিয়ে থ্রী-সেকেণ্ড কেমিক্যাল ফিউজটা একটু কুঁকড়ে দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল সেটা মিশ্রী খান পাশে দাঁড়ানো লঞ্চের এঞ্জিনরুমের ভেতর। আর সঙ্গে সঙ্গে আলতাফের দুটো গরিলা সদৃশ প্রকাণ্ড হাত ওর পাশের দু'জন অফিসারের মাথা দুটো ভয়ঙ্কর জোরে ঠুকে দিল। ঠাস্ করে দুটো খোসা ছাড়ানো নারকেলে বাড়ি লাগল যেন। পরমুহূর্তে চারজনেই ওরা শুয়ে পড়ল পাটাতনের ওপর।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সাথে সাথে ধোঁয়া আর আগুনের হল্কা উঠল আকাশের দিকে। ভারতীয় টহলদারী লঞ্চের একটা রেলিং মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল দশগজ তফাতে। জোর ঝাঁকুনি খেল নৌকাটা। ধাক্কা খেয়ে কিছুটা সরে এল জ্বলন্ত লঞ্চ থেকে। তারপর সব চুপ।

কানে তালা লেগে গেছে রানার। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সে পাটাতনের ওপর। ডুবে যাচ্ছে লঞ্চটা। মিশ্রী খানের বোমায় এঞ্জিনরুমের তলা নিশ্চয়ই খসে গেছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে লঞ্চ। শুকনো কাঠ জ্বলছে, তাই ধোঁয়াও নেই, আর ধোঁয়া দেখে অনুসন্ধিৎসু প্লেনের আশঙ্কাও নেই। আধ মিনিটেই চলে যাবে লঞ্চটা পানির তলায়। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল রানার একজন লোকের ওপর। ছুরির মত কোনও লোহার পাত লেগে চিরে গেছে পেটটা। নাড়ি-ভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে ডেকের ওপর। বেঁচে আছে এখনও। এক হাতে পেট চেপে ধরে হামাগুড়ি দিয়ে আগুন থেকে সরে আসতে চাইছে সে। বীভৎস সে দৃশ্য। চোখে-মুখে তার মৃত্যুর আতঙ্ক। ভাঙা-চোরা ডেকের ওপর উঠে এল পানি। দপ্ করে নিভে গেল আগুন। ধীরে ধীরে ডুবে গেল লঞ্চটা। খানিকটা সাদা ফেনা আর তৈলাক্ত বুদ্বুদ ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট রইল না। শান্ত আরব সাগরে মৃদু হাওয়া- চারদিক নিস্তব্ধ। একটা উল্টানো হেলমেট ভেসে যাচ্ছিল, ডুবিয়ে দিল রানা সেটাকে। চিহ্নমাত্র রইল না আর এতবড় লঞ্চটার।

নিজেদের নৌকার দিকে ফিরল এবার রানা। প্রকাণ্ড দেহী আলতাফ আর বাচাল মিশ্রী খান উঠে দাঁড়িয়েছে। মাহবুবও উঠে বসবার চেষ্টা করছে। ওর জুলফির কাছে একটা ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে। মিশ্রী খান এগিয়ে গেল সবচেয়ে আগে। ক্ষতটা পরীক্ষা করে ডাক্তারী চালে বলল, 'কিচ্ছু হয়নি। সামান্য বাড়ি লেগেছে কাঠের টুকরোর।' ইমার্জেন্সী মেডিকেল কিট খুলে ডেটল দিয়ে ধুয়ে জায়গাটায় সার্জিক্যাল টেপ লাগিয়ে দিল সে।

আলতাফ ব্রোহী বিষণ্ন মুখে দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ। ওর পায়ের কাছে পড়ে আছে কারবাইন-ধারী অফিসার দুজন। ওর দিকে চেয়ে রানা বুঝল ওর মানসিক অবস্থাটা।

'শেষ?' জিজ্ঞেস করল সে মৃদুকণ্ঠে।

মাথা নাড়ল আলতাফ ব্রোহী।

'হ্যাঁ! অতিরিক্ত জোরে মেরেছিলাম।' ভারি শোনায় ওর কণ্ঠস্বর।

রানা জানে বহু লোক প্রাণ দিয়েছে আলতাফ ব্রোহীর হাতে। যখনই সে মেরেছে; দক্ষ হাতে নির্দয়ভাবে মেরেছে। কিন্তু প্রতিবারই অনুশোচনায় নিজেকেও সেই সাথে দগ্ধে মেরেছে। ওর ধারণা কারও প্রাণ নেবার তার কোনও অধিকার নেই। খোদা এভাবে অপঘাতে মরবার জন্যে প্রাণ সৃষ্টি করেননি। কিন্তু বেশি লোকের বেশির ভাগ ভাল-র জন্যে অসংখ্য প্রাণ শিখা নিজ হাতে নিভিয়ে দিতে হয়েছে ওকে। প্রতিবারই বিবেক দংশন করেছে ওকে- প্রতিবারই ওর মনে হয়েছে, হয়তো অন্য কোনও উপায় ছিল, হয়তো এদের মৃত্যুর সত্যিই কোনও প্রয়োজন ছিল না। প্রতিবারই ওকে অনেক যুক্তি-তর্ক দিয়ে নিজের মনকে বোঝাতে হয়েছে যে সে হত্যা করেছে প্রতিশোধের জন্যে নয়, ঘৃণার জন্যে নয়, জাতীয়তাবাদ কিংবা 'ইজম্' তো নয়ই- অন্যায়কে দমন করে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্যে।

'আর কারও কিছু লাগেনি তো? মিশ্রী?'

'না, ওস্তাদ।'

'বেশ। আলতাফ, পাল তুলে দাও। নয়টা বাজতে যাচ্ছে। সিগন্যালের সময় হয়ে গেছে। মাহবুব হাল অ্যাডজাস্ট করে করাচি টিউন করবার চেষ্টা করে দেখো।' আকাশের দিকে একবার চেয়ে বলল, 'ওদের ফোরকাস্টটাও শোনা দরকার। এখন আপাতত যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল।'

রেডিও রিসিপশন ভাল হলো না। মাঝে মাঝে ঘড়র্-ঘর্ করে বিকট শব্দ হচ্ছে। পশ্চিম আকাশের খানিকটা জায়গা কালো মেঘে ছেয়ে গিয়েছে। মাহবুব বলল ওর মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তাই এই আওয়াজটা। আওয়াজটা একবার বেড়ে যাচ্ছে, একবার কমে যাচ্ছে।

'স্যামসন কলিং ডেলায়লা।' করাচি আর কম্যাণ্ডো গ্রুপের কোড। 'ক্যান ইউ হিয়ার মি লাউড অ্যাণ্ড ক্লিয়ার?'

মাহবুব হাঁ-বাচক টোকা দিল।

'স্যামসন কলিং ডেলায়লা। এনি ট্রাবল্?'

আবার হাঁ-বাচক টোকা।

'এঞ্জিন ট্রাবল্?'

আবার টোকা।

'এনিমি ট্রাবল্?'

রানার দিকে চাইল মাহবুব। রানা মাথা নাড়তেই আবার হাঁ-বাচক টোকা দিল মাহবুব। রানা স্পষ্ট মানসচক্ষে দেখতে পেল কমোডোরের কুঞ্চিত ভ্রূ, উদ্বিগ্ন চেহারা।

'অল ক্লিয়ার নাউ?'

আবার টোকা।

'নাউ ওয়েদার ফোরকাস্ট ফর ডেলায়লা। হেভি রেনফল

অ্যাসোশিয়েটেড উইথ থাণ্ডার অ্যাণ্ড স্টর্ম এক্সপেক্টেড বিফোর নূন। টেম্পারেচার ফলিং, ভিজিবিলিটি পুওর। ডেঞ্জার সিগন্যাল- এইট।'

ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে মিশ্রী খানের মুখ। এই ভয়ই সে করেছিল। সাঁতার জানে না সে। জানলেও কোন লাভ হত না, কিন্তু কিছুক্ষণ তো অন্তত ভেসে থাকা যেত। বেশ খানিকটা উঠে এসেছে পশ্চিমের মেঘ। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই চুকে যাবে সব লীলা খেলা।

রানাও চিন্তিত হয়ে পড়ল। উঠে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল মাহবুবের ম্যাপের ওপর। ছ'মাইল দূরে আছে একটা ছোট্ট দ্বীপ। ঝড়ের আগে গিয়ে পৌঁছতে পারবে সেখানে? চোখ তুলেই দেখল মাহবুব বুঝতে পেরেছে ওর মনের কথা। বলল, 'বৈঠা চালালে অসম্ভব না-ও হতে পারে, স্যার।'

'ঠিক বলেছ। তুমি এঞ্জিনটার পেছনে লাগো। আমরা শেষ চেষ্টা করে দেখি।'

'কিন্তু ওই দ্বীপটায় ভারতীয় সৈন্য থাকার সম্ভাবনা আছে।'

'জানি। কিন্তু ডুবে মরার চেয়ে বন্দী হওয়া ভাল। যাও, কুইক।'

আধঘণ্টা পরই তুমুল জোরে বৃষ্টি নেমে গেল। চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। তীরের মত বৃষ্টির ফোঁটা এসে বিঁধছে তিনজনের চোখে-মুখে। হাওয়ার বেগ বাড়ছে ক্রমেই। অক্লান্ত ভাবে বৈঠা চালাচ্ছে তিনজন। এঞ্জিনের কাজ ছেড়ে হাল ধরে বসেছে মাহবুব। হঠাৎ উল্লসিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল মাহবুব।

'এসে গেছি!'

তিন

সন্ধ্যা নামার আধঘণ্টা আগেই অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। সারা আকাশ মেঘে ঢাকা। অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না রানা। ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে নৌকাটা। এখান-ওখান থেকে খসে পড়ে যাচ্ছে নড়বড়ে অংশগুলো ঢেউ আর বাতাসের অবিরাম ধাক্কায়। সামনের গলুই আর মাস্তুলের কাঠ ভেঙে পড়ে গেছে একঘণ্টা আগেই। এখন যে-কোনও মুহূর্তে মড়মড় করে খসে যাবে তলিটা।

ঠিক দুটোর সময় দ্বীপটা ছেড়ে রওনা হতে হয়েছে ওদের। ঝড়ের বেগ কমে গেলেও সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ শান্ত হতে অনেক দেরি আছে, কিন্তু পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিল ওরা, আট-দশজন সৈনিক এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। নিশ্চিত কোনও সংবাদ পেয়ে আসছে, না এটা রুটিন চেক বুঝবার উপায় নেই। এক সেট নকল কাগজপত্র আছে ওদের কাছে, কাপড়-চোপড়ও

বদলে খাঁটি ভারতীয় নাগরিক হয়ে গেছে ওরা- কিন্তু ঝুঁকিটা নিল না রানা। উত্তাল তরঙ্গে ভাসিয়ে দিল নৌকা নোঙর তুলে। বিশ মিনিটের মধ্যেই ঠিক হয়ে গেল এঞ্জিন। চালু করে দিয়ে হাল ধরে বসল মাহবুব। বিশ গজ দূরেও কিছু দেখা যাচ্ছে না। তাই কম্পাস আর চার্টের ওপর ছুটাছুটি করতে থাকল ওর চোখ জোড়া। এমনি সময় মাস্তুলটা ভেঙে পড়ল ওর ওপর। বাম কাঁধে ভয়ানক চোট পেয়েছে সে। কিন্তু হাল থেকে নড়ানো গেল না ওকে।

গত চারটি ঘণ্টার ইতিহাস প্রকৃতির স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে কয়েকটি দুর্ধর্ষ মানুষের একটানা অবিরাম যুদ্ধের ইতিহাস।

পিঠটা সোজা করে দাঁড়াল রানা। কাঁধের পেশী অবশ হয়ে গেছে, মেরুদণ্ডে অসম্ভব ব্যথা। গত দুই ঘণ্টা ধরে সে কেবল একবার বাঁকা হচ্ছে, একবার সোজা হচ্ছে। কয়েক হাজার গ্যালন পানি তুলেছে মিশ্রী খান নিচ থেকে বালতি করে, ঝুঁকে সে বালতি ধরে রানাকে ফেলতে হয়েছে পানি। পানি উঠছে নৌকায়। আলতাফের হ্যাণ্ড পাম্পে ঠেকানো যাচ্ছে না, তাই নৌকার নিচে নামতে হয়েছে মিশ্রী খানকে। সী-সিক্‌নেস সহ্য করতে না পেরে অনর্গল বমি করছে বেচারা মিশ্রী খান, তাই নিয়ে অক্লান্তভাবে বালতির পর বালতি পানি তুলে যাচ্ছে সে। রানা ভাবল, আশ্চর্য মনের বল না থাকলে কি আর এত বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে ওকে বাছাই করা হয়েছে? সমস্ত মানসিক শক্তি একত্রীভূত করে ভূতের মত খেটে চলেছে সে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

এক হাতে চোখ মুছল রানা। দেখল পাগলের মত পাম্প করে চলেছে আলতাফ ব্রোহী। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, হাত দুটো ঠিক এঞ্জিনের পিস্টনের মত উঠছে-নামছে। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। কেবল উঠছে আর নামছে। বিশ মিনিট করেই পরিশ্রান্ত রানা আলতাফের হাতে দিয়েছিল পাম্পটা। সেই থেকে এক নাগাড়ে পাম্প করে যাচ্ছে আলতাফ, যেন কিছুই হয়নি। ক্লান্তি নেই। শ্রান্তি নেই। মৃদু হাসল রানা। একটা কথাই কেবল মনে হলো, ইনডেস্ট্রাকটিব্‌ল্!

মাহবুবের দিকে ফিরে চাইল রানা। ফুলে আছে কপালটা। মাস্তুলটা প্রথমে কপালে বাড়ি লেগে তারপর কাঁধের ওপর পড়েছিল। স্থির হাতে হাল ধরে আছে সে। একবার কম্পাস দেখছে, পরমুহূর্তেই চোখ যাচ্ছে ওর চার্টের দিকে। মাঝে মাঝে নেমে গিয়ে পরীক্ষা করছে এঞ্জিন। এখন একমাত্র ভরসা জং ধরা ওই এঞ্জিনটাই। ওটা বন্ধ হলেই সব শেষ। আর কোন আশা থাকবে না।

আবার বালতি উঠল ওপরে। ঝপাৎ করে ফেলল রানা পানিটুকু, আবার নামিয়ে দিল সেটা গর্ত দিয়ে। গর্ব হলো ওর। কি আশ্চর্য সব দুঃসাহসী লোক জুটেছে এখানে! নিজেকে এদের নেতা ভাবতে সত্যিই গর্ব বোধ করল রানা। এদেরকে ঠিক মত বর্ণনা করবার ভাষা নেই। এরা দেশের গৌরব।

পৃথিবীর গৌরব।

হঠাৎ একটা মস্ত ঢেউ লেগে দুলে উঠল নৌকাটা ভয়ানক ভাবে। কোনও মতে টাল সামলে নিল রানা। পাটাতনের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেল একরাশ পানি। চারদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। আরেক বালতি পানি উঠাল মিশ্রী খান। কিন্তু রানা সেটা ধরল না। রানার মাথায় তখন দ্রুত চিন্তা চলছে। কিছু একটা স্মরণ করবার চেষ্টা করছে সে। অত্যন্ত জরুরী কোন কথা। কিন্তু মনে আসছে না সেটা কিছুতেই। এবার আগের চেয়েও বড় আরেকটা ঢেউ এসে বয়ে গেল ডেকের ওপর দিয়ে। হঠাৎ বুঝতে পারল রানা ব্যাপারটা। তীর থেকে পনেরো গজ দূরেও নেই ওরা এখন।

'মাহবুব, জলদি ব্যাক গিয়ার দাও! নইলে এখুনি পারে গিয়ে ধাক্কা খাবে!'

বিদ্যুৎ চমকে উঠল একবার। উঁচু পাড় দেখা গেল পরিষ্কার। আলতাফ গিয়ে হাল ধরেছে, মিশ্রী খান উঠে এসে নৌকার একপাশে পুরানো একজোড়া ট্রাকের টায়ার বেঁধে দিল, প্রথম ধাক্কাতেই যেন নৌকাটা গুঁড়িয়ে না যায়। বাতাসের ঠেলায় এগিয়ে যাচ্ছে নৌকাটা- মাহবুব চেষ্টা করছে গতিরোধ করবার।

আবার ঝলসে উঠল বিদ্যুতের আলো। প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু পাড়, কিন্তু আট-দশ ফুট উঁচুতে সিঁড়ির মত একটা তিন ফুট চওড়া তাক আছে। হুক লাগানো একটা রশি গলায় পেঁচিয়ে নিল রানা। প্রথমবার নৌকাটা পারের পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেতেই লাফিয়ে ধরল রানা আট ফুট উঁচু ধাপের কিনারা। কিন্তু পিচ্ছিল পাথরে হাত পিছলে নেমে আসছে সে নিচে। আঁকড়ে ধরে থাকতে পারছে না। এখন পড়ে গেলে নৌকা আর পাড়ের মাঝখানে চাপ খেয়ে চেপ্টা হয়ে যাবে। এমনি সময় নিচ থেকে আলতাফের হাতের এক প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে অর্ধেক শরীর উঠে এল রানার ওপরে। বেল্টের সাথে বেধে গেল একটা চোখা পাথর। প্যান্টটা বুকের কাছে উঠে এসেছে দেহের ভারে। ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে চারদিকে দেখল রানা ঝুলন্ত অবস্থায়। কব্জির সমান মোটা একটা শিকড় বাধল হাতে। তিন সেকেণ্ডের মধ্যে উঠে দাঁড়াল সে প্রথম ধাপের ওপর। রশিটা শক্ত করে শিকড়ের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে দিল নিচে। একটা হুড লাগানো টর্চ জ্বেলে ধরল।

ঢেউগুলো তুলে এনে একবার আছড়ে ফেলছে নৌকাটাকে পারের ওপর, আবার টেনে নিয়ে যাচ্ছে কয়েক হাত পেছনে। মাহবুব এঞ্জিনটা একবার সামনে একবার পেছনে চালিয়ে স্থির রাখবার চেষ্টা করছে নৌকা। কিন্তু ইতিমধ্যেই চুর চুর হয়ে ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছে নৌকাটা। আলতাফ আর মিশ্রী খান দাঁড়িয়ে আছে কোনও রকমে দেহের ভারসাম্য বজায় রেখে। ডুবে যাচ্ছে নৌকা।

‘রশি বেয়ে উঠে এসো সবাই। মাহবুবকে ডাকো, আলতাফ!’ চিৎকার করে উঠল রানা।

রানা দেখল আলতাফ আর মিশ্রী খান নিচু গলায় কিছু বলল নিজেদের মধ্যে। ছুটে গিয়ে মাহবুবকে টেনে বের করল আলতাফ এঞ্জিনরূম থেকে। কিছু বলবার আগেই ওর হাতে রশি ধরিয়ে দিয়ে ঠেলে রওনা করিয়ে দিল ওকে ওপর দিকে। রানা একহাতে ধরে ফেলল মাহবুবের হাত, টেনে তুলল ওপরে।

‘এবার তুমি, মিশ্রী খান,’ আবার বলল রানা। ‘জলদি করো, ডুবে যাবে নৌকা।’

রানা দেখল মিশ্রী খান হাসছে ওর দিকে চেয়ে। রশির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ছুটল সে তিরপল ঢাকা ছাপড়ার দিকে।

বলল, ‘এক মিনিট, ওস্তাদ, আমার জর্দার কৌটোর কথা ভুলে গিয়েছিলাম।’

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ফিরে এল সে এক্সপ্লোসিভের বাক্স নিয়ে। আলতাফের হাতে বাক্সটা দিয়েই ছুটল সে ছাপড়ার দিকে। প্রায় আধমণ পাউডার ভর্তি বাক্সটা ছুঁড়ে দিল আলতাফ ওপরে। ধরে ফেলল রানা, ব্যালান্স হারিয়ে ফেলছিল, পিঠের কাছে জামা ধরে টেনে সোজা করে দিল মাহবুব।

‘এই সব জঞ্জাল রাখো তো!’ ধমকে উঠল রানা। ‘নিজেরা উঠে এসো ওপরে। এক্ষুণি।’

দমাদম ছুঁড়তে থাকল ওরা নিচ থেকে সমস্ত জিনিসপত্র। খাবার, কাপড়, অস্ত্রশস্ত্র। মাহবুব সেগুলো গুছিয়ে রাখছে।

‘শুনতে পাচ্ছ না তোমরা আমার কথা?’ গর্জে উঠল রানা। ‘এই মুহূর্তে ওপরে উঠে এসো বলছি! এটা আমার অর্ডার। আরে, নৌকাটা ডুবে যাচ্ছে যে, গর্দভ কোথাকার!’

নৌকাটা ডুবছে সত্যিই, কিন্তু পেটটা পানি ভরে ঢোল হয়ে যাওয়াতে ঢেউয়ের ধাক্কা খুব বেশি আর দোলাতে পারছে না ওকে। পারের সাথে ধাক্কাও লাগছে অপেক্ষাকৃত আস্তে। এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল মিশ্রী আর আলতাফ।

‘আপনার একটা কথাও শুনতে পাচ্ছি না, ওস্তাদ।’ এক হাত কানে তুলে না শোনার ভান করল মিশ্রী খান। ‘তাছাড়া ডুবতে এখনও দেরি আছে।’ এক দৌড়ে অদৃশ্য হলো সে আবার তিরপলের নিচে।

এক মিনিটের মধ্যে বাকি জিনিসপত্র উঠে এল ওপরে। মিশ্রী খান যখন ওপরে উঠে এল তখন ডেকের ওপর উঠে হুড়মুড় করে ঢুকছে পানি এঞ্জিন রূমের মধ্যে। সামনের দিকটা অদৃশ্য হয়েছে পানির তলায়। এবার পেছন দিকটাও গেল তলিয়ে। আলতাফ যখন রশি ধরল তখন নৌকার চিহ্নমাত্র

নেই, এক হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে আছে সে। উঠে এল আলতাফও।

সবাই অবাক হয়ে চেয়ে দেখল, যে নৌকায় করে গত চব্বিশ ঘণ্টায় একশো পঁয়ত্রিশ মাইল এল ওরা, ডিউটি শেষ হতেই তলিয়ে গেছে সেটা। ভোজ-বাজির মত অলৌকিক মনে হচ্ছে এখন ওটার অস্তিত্ব। যেন ঠিক উবে গেছে- একটা বুদ্বুদও নেই ওটার অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্যে।

পা ছড়িয়ে পাথরের ওপর বসে পড়ল মিশ্রী খান। বৃষ্টির ছাঁট লাগছে না গায়ে। ভেতরের পকেট থেকে কিং স্টর্কের প্যাকেট বের করে সবাইকে একটা করে দান করল সে। বুক ভর্তি করে একরাশ কড়া ধোঁয়া নিয়ে পরম তৃপ্তির সাথে ছাড়ল নাক-মুখ দিয়ে। তারপর বলে উঠল, ‘ইয়া আল্লা! সত্যিই বেঁচে আছি এখনও!’

চার

‘আমি আর আলতাফ আগে উঠে যাব ওপরে। জিনিসপত্র ওপরে তোলা হয়ে গেলে তোমরা দু’জন আসবে।’ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা।

মস্ত বড় কোনও গাছের অসংখ্য শিকড় বেরিয়ে আছে বিশ ফুট প্রায় খাড়া হয়ে থাকা পাহাড়টার গা থেকে। দড়িটা কয়েকবার ছুঁড়ে দিয়েও যখন কোনও কিছুর সঙ্গে বাধাতে পারল না, তখন এই শিকড় বেয়ে ওঠাই স্থির করল রানা। যে-কোনও মুহূর্তে শিকড় ছিঁড়ে পাথরের ওপর পড়ে হাড়গোড় ভাঙবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এছাড়া আর উপায়ই বা কি।

হাত ছাড়া আর কিছুর সাহায্য নিতে পারছে না ওরা। পা রাখার কোনও জায়গা নেই। অনেকটা রশি বেয়ে ওঠার মত। একটা করে শক্ত মত শিকড় ধরছে, টেনে দেখছে ছিঁড়ে যাবে কিনা, তারপর এক হাতের ওপর ভর দিয়ে উঠছে ছয় ইঞ্চি, অপর হাত খুঁজছে আরেকটা শিকড়। অতি সাবধানে এইভাবে একফুট-দুইফুট করে উঠে যাচ্ছে ওরা ওপরে। সাত মিনিটের মধ্যেই দুই হাত ব্যথা হয়ে গেল রানার। বাইসেপের পেশী দুটো কাঁপছে থর-থর করে। হাতে আর শক্তি নেই। দুই হাতে শিকড় ধরে ঝুলে থাকল সে কিছুক্ষণ। আরও পাঁচ ফুট উঠতে হবে। হাঁপাচ্ছে রানা। হৃৎপিণ্ডটা ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে বুকের ভেতর থেকে। মাথাটা কাৎ করে দেখল, আলতাফ হাসছে ওর দিকে চেয়ে।

'আলতাফ!' ফিস্ ফিস্ করে বলল রানা, 'বাকিটুকু খুব সাবধানে উঠতে হবে। কিসের যেন শব্দ পেলাম!'

মাথা ঝাঁকাল আলতাফ। আবার উঠতে থাকল ওরা। দুই মিনিট পর দুই হাতে ধরল রানা কিনারের একটা পাথর।

ধীরে, অত্যন্ত সাবধানে মাথাটা উঁচু করল রানা। চোখ জোড়া ওপরে উঠতেই থেমে গেল সে। চারদিকের অন্ধকারে একবার চোখ বুলাল। প্রকাণ্ড একটা বট গাছ ঝড়ে উপড়ে পড়ে আছে বেশ খানিকটা দূরে। এই বটেরই শিকড় ধরে উঠেছে ওরা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল সে চারদিকে। সমস্ত অনুভূতি শ্রবণেন্দ্রিয়ে একত্রীভূত করবার চেষ্টা করল। নাহ্, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। বাতাসের শন্‌শন্ শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনাও যাচ্ছে না। যতদূর দেখা যাচ্ছে অন্ধকার আর অন্ধকার। কোথাও একটু বেশি গাঢ়, কোথাও হালকা। নিজের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে হাসি পেল রানার। এই মুহূর্তে কেউ যদি লাথি মেরে ওর আঙুলগুলো সরিয়ে দেয় তাহলেও কিছু করবার উপায় নেই ওর। এক ঝাঁকিতে দুই হাতের ওপর ভর দিয়ে বুক পর্যন্ত উঠে এল সে ওপরে।

হঠাৎ চমকে উঠল রানা। লাফিয়ে উঠল ওর হৃৎপিণ্ড। বেশ কিছুটা দূরে বড় বড় গোটা কয়েক পাথরের চাঁই পড়ে ছিল- একটা পাথর নড়ে উঠল। উঠে দাঁড়াল একজন লোক। দশ গজও হবে না। এগিয়ে আসছে ছায়া-মূর্তিটা এদিকে। এই অন্ধকারেও পরিষ্কার চিনতে পারল রানা- আর্মি গার্ড। গায়ে রেইনকোট, পায়ে গাম বুট, মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ। সেনা বাহিনীর লোক- ভুল নেই তাতে।

দুই সেকেণ্ড পাথরের মত নিশ্চল হয়ে রইল রানা। বুকের রক্ত হিম হয়ে জমে গেছে। কিচ্ছু ভাবতে পারছে না সে আর। এইভাবে মৃত্যুই তাহলে কপালে লেখা ছিল! কয়েক পা এগিয়ে এসেছে সেন্ট্রি। রাইফেল প্রস্তুত। মাথাটা একপাশে সরিয়ে কিছু শুনবার চেষ্টা করছে যেন সে। বাতাসের সাঁই সাঁই শব্দ আর সমুদ্র তরঙ্গের উচ্ছ্বাসকে ছাপিয়ে আরও কিছু যেন শুনবার চেষ্টা করছে সে।

রানা সামলে নিয়েছে নিজেকে। এখন ওপরে উঠবার চেষ্টা করা আত্মহত্যারই সামিল। কিছুটা শব্দ হবেই, এবং বিনা দ্বিধায় গুলি করবে প্রহরী। আবার নিচে নামতে হবে তাকে। অত্যন্ত সাবধানে নামতে হবে। এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি করে। দ্রুত কিছু করতে গেলেই ধরা পড়ে যাবে ওর চোখে।

অতি যত্নের সঙ্গে ধীরে ধীরে মাথাটা নামাল রানা নিচে। প্রহরীটা এগিয়ে আসছে। রানার গজ পাঁচেক ডাইনে ওর লক্ষ্যবিন্দু। মাথাটা অদৃশ্য হয়ে গেল রানার। দুই হাতের আটটা আঙুল ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট রইল না ওপরে। আলতাফ দুই ফুট নিচে থাকতে আর শিকড় পায়নি হাতের কাছে। কিছুটা নেমে আবার উঠল সে রানার পাশে। কানে কানে জিজ্ঞেস করল, 'কি

ব্যাপার, রানা?'

'সেন্ট্রি!' ফিস ফিস করে জবাব দিল রানা। 'ও কিছু শুনেছে। খুঁজছে আমাদের।'

হঠাৎ দেয়ালের গায়ে সেঁটে গেল রানা। আলতাফও তাই করল। ঝলসে উঠল এক ঝলক আলো। ওদের অনভ্যস্ত চোখ আঁধার হয়ে গেল। টর্চ জ্বেলে সেন্ট্রিটা এবার পাড়টা পরীক্ষা করছে মনোযোগের সাথে। কিনার থেকে কয়েক ফুট দূর দিয়ে হাঁটছে সে। এই ঝড়ের রাতে পা পিছলে নিচে পড়ে যাওয়ার ভয়েই বোধহয়। কিংবা কিনার দিয়ে হাঁটলে হঠাৎ একটা হাত এগিয়ে এসে খপ করে পা ধরে টেনে ফেলে দিতে পারে নিচে, সেই ভয়ে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে আলোটা। রানা বুঝল ওর আঙুলগুলো সেন্ট্রি দেখতে পাবেই। কারণ সে পরিষ্কার উপলব্ধি করল, কেবল সন্দেহপ্রবণ হয়েই যে লোকটা খুঁজছে তা নয়, লোকটা স্থির নিশ্চিত যে কিছু না কিছু সে দেখতে পাবেই। এবং যতক্ষণ খুঁজে না পাচ্ছে ততক্ষণ থামবে না। এই অবস্থায় বাদুড়-ঝোলা হয়ে ওর হাতে ধরা পড়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। এমনি সময় এক হাতে স্পর্শ করল আলতাফ রানার হাত।

'একটা পাথর!' ফিসফিস করে বলল আলতাফ। 'ওর পেছন দিকে ফেলতে হবে।'

ডান হাতে খুঁজল রানা কিনারটা, কাদা আর ঘাসের গুচ্ছ ছাড়া কিছুই ঠেকল না হাতে। একটা মার্বেলের অর্ধেক সাইজ পাথরও পেল না সে। হঠাৎ মনে পড়ল ওর অফিসের একটা চাবি রয়ে গেছে ওর পকেটে। আলোটা তখন তিন ফুট দূরে। চাবিটা বের করে ছুঁড়ে মারল সে বাম দিকের অন্ধকারে আন্দাজের ওপর কয়েকটা পাথর লক্ষ্য করে। এক সেকেণ্ড পার হয়ে গেল, তারপর দুই সেকেণ্ড, রানার মনে হলো পাথরে লাগেনি চাবিটা- হয়তো কাদায় পড়েছে। আলোটা আলতাফের কাঁধ থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে আছে। এমনি সময় ঠং করে পাথরের ওপর চাবির শব্দ হলো। ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল সেন্ট্রি। একবার অনেকখানি জায়গার ওপর টর্চটা বুলিয়ে দেখে নিয়ে আলো ফেলল সে পাথরগুলোর ওপর। তারপর ছুটল সেদিকে। রাইফেলটা টর্চের সাথে চেপে ধরেছে সে। চকচক করছে ব্যারেলটা আলো পড়ে।

গার্ডটা দশ গজও যায়নি, চিতাবাঘের মত নিঃশব্দে উঠে গেল আলতাফ ওপরে। ছুটে গিয়ে ঝড়ে পড়া গাছটার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

বিশ গজ দূরে সেন্ট্রিটা তখন ভয়ে ভয়ে এ-পাথর, ও-পাথরের ওপর আলো ফেলছে। আলতাফ ওর ছুরির বাঁট দিয়ে একটা পাথরের ওপর দুটো টোকা দিল। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল সেন্ট্রি। গাছটার দিকে আলো ফেলল, তারপর পিচ্ছিল পাথরের ওপর দিয়ে আনাড়ির মত দৌড় দিল গাছের দিকে। হাঁটুর কাছে রেইনকোটের ফ্ল্যাপ দুটো বাড়ি খাচ্ছে। দৌড়ের ফলে টর্চটা দুলছে ওপর নিচে। রানা এক নজর দেখতে পেল সেন্ট্রির বিভ্রান্ত

চেহারাটা। অল্পবয়সী- মাহবুবের সমান হবে। ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে আছে দুই চোখ। রানা ভাবল, একমাত্র খোদাই জানে বেচারার মনের মধ্যে এখন ভয় আর আতঙ্কের কি প্রবল আলোড়ন চলেছে। নির্জন সমুদ্রের উঁচু পাড়ের ওপর ঠুং-ঠাং খুট-খাট শব্দ, অথচ কাউকে দেখা যাচ্ছে না; নিঃসঙ্গ, একাকী সে। ঝড়-বৃষ্টির অন্ধকার রাতে বাতাসের সাঁই-সাঁই শব্দ আর সাগরের ক্রুদ্ধ গর্জন। ভয় পেয়েছে ছেলেটা। রানার মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা মমত্ববোধ জাগল। রানারই মত সে-ও মানুষ, কারও আদরের সন্তান, কিংবা ভাই, অথবা স্বামী, প্রিয়তম। কর্তব্য পালন করতে এসেছে সে, ওপরওয়ালার হুকুম তামিল করছে মাত্র। দুঃখ হলো রানার এই একাকী, উদ্বিগ্ন, আতঙ্কিত ছেলেটির জন্যে। অথচ মরতেই হবে একে। আর দশ সেকেণ্ডের মধ্যেই মৃত্যু হবে ওর। ধীরে ধীরে মাথা তুলল রানা ওপরে।

'বাঁচাও! বাঁচাও!' ককিয়ে উঠল রানা। স্পড়ে যাচ্ছি, ধরো!'

থমকে দাঁড়াল আতঙ্কিত সেন্ট্রি আলতাফ যেখানটায় লুকিয়ে আছে তার চার ফুটের মধ্যে। ঘুরে দাঁড়াল রানার দিকে। এক সেকেণ্ড এদিক ওদিক খুঁজে স্থির হলো আলোটা এসে রানার মুখের ওপর। একমুহূর্ত মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থেকে রাইফেল তুলল সে কাঁধে। পরমুহূর্তেই একটা চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। ঢলে পড়ল সে মাটিতে।

উঠে এল রানা ওপরে। মৃত সেন্ট্রির দিকে চাইল একবার। রক্ত মাখা ছুরিটা সেন্ট্রির রেইনকোটে মুছে নিয়ে বেল্টে বাঁধা খাপের মধ্যে রেখে দিল আলতাফ।

'এতে কি প্রমাণ হয়, রানা?' জিজ্ঞেস করল আলতাফ। লোকজনের সামনে মেজর বলে ডাকে সে রানাকে। স্পর পর অনেকগুলো দৈব-সংযোগ। সন্দেহজনক, তাই না?'

'হ্যাঁ। লঞ্চে করে তাড়া, দ্বীপে সৈনিক, এখানে পৌঁছে গার্ড! কেটি বন্দরের সেই ক্যাপ্টেনের কপাল খারাপ। কমোডোর জুলফিকার আর আমাদের বুড়ো মিা, কেউ ছাড়বে না ওকে। আস্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে।'

মাথা ঝাঁকাল আলতাফ।

'ও নিশ্চয়ই করিমকে ছেড়ে দিয়েছিল।'

'নিশ্চয়ই, তাছাড়া আর কে জানবে আমাদের গন্তব্যস্থল? এরা আমাদের পৌঁছানোর অপেক্ষায় প্রস্তুত আছে। এই ঝড়ের রাতেও অন্ততঃপক্ষে তিরিশ-চল্লিশটা গার্ড মোতায়েন করে দিয়েছে এই পাহাড়ী সমুদ্র-তীরে।' গলার স্বরটা নিচু করে প্রায় আপন মনে বলল রানা, 'এখন যত শিগগির সম্ভব সরে যেতে হবে এখান থেকে।'

'সিগন্যাল, তাই না?' বলল আলতাফ। 'ওরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে নিশ্চয়ই কোনও সিগন্যালের ব্যবস্থা করেছে। হয়তো ফ্লেয়ার…'

'না। তাহলে ওদের অবস্থান জেনে ফেলার সম্ভাবনা আছে আমাদের। খুব সম্ভব টেলিফোন। ফিল্ড টেলিফোনে যোগাযোগ রাখছে ওরা। ফ্লেয়ার নয়।'

মাথা ঝাঁকাল আলতাফ। মাটি থেকে মরা সেন্ট্রির টর্চটা তুলে নিয়ে চারদিক খুঁজল। আধ মিনিটের মধ্যেই তার পাওয়া গেল খুঁজে, আর আধ মিনিটের মধ্যেই সেই তার ধরে গিয়ে দেখা গেল পাথরের আড়ালে রাখা আছে একটা টেলিফোন সেট।

'এখন পালানো ছাড়া আর কোনও উপায় দেখছি না। যদি রিং হয়, জবাব দিতে হবে, নইলে সব ব্যাটা ছুটে আসবে এখানে। কিন্তু ব্যাটাদের কোনও কোড সিগন্যাল থাকলেই গেছি।' কয়েক পা এগিয়েই থামল রানা। 'কিন্তু আলতাফ, আর কিছুক্ষণের মধ্যে কেউ না কেউ এসে পড়বেই। হয়তো কোনও সার্জেন্ট, নয়তো কোনও রিলিফ, কিংবা হয়তো একে পনেরো মিনিট পর পর রিপোর্ট করবার আদেশ দেয়া হয়েছিল। যে-কোনও মুহূর্তে বিনা নোটিসে কেউ এসে হাজির হতে পারে। ধরো, লাশটা ছুঁড়ে ফেলে দিই সমুদ্রে।'

গাছের একটা মোটা ডালের সাথে শক্ত করে রশিটা বেঁধে ঝুলিয়ে দিল রানা নিচে। এক্সপ্লোসিভের বাক্সটা এল প্রথম, তারপর একে একে আসতে থাকল অন্যান্য জিনিসপত্র। আলতাফ টেনে তুলছে মালগুলো, রানা বসে আছে টেলিফোনের পাশে। হঠাৎ 'আহ্হা' বলে উঠল আলতাফ। তিন লাফে কাছে চলে এল রানা।

'কি ব্যাপার, আলতাফ?'

'কি যেন একটা জিনিস খসে পড়ে গেল। ভালমত বাঁধতে পারেনি।'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রানা, কড়-কড়াৎ করে বাজ পড়ল কাছেই কোথাও। পোড়া তামাটে গন্ধ এল নাকে।

'সেরেছে। আর একটু হলেই মাথায় পড়ত। যাক, কি জিনিস খোয়া গেল?'

প্রশ্নটা করেই রানা বুঝতে পারল জিনিসটা কি। ও নিজেই সাজিয়ে রেখেছিল ওগুলো গুরুত্ব অনুসারে।

'খাবার,' বলল আলতাফ। 'খাবার, স্টোভ- সব।'

দমে গেল রানা। খাবার ছাড়া এই অজানা অচেনা শত্রুদেশে চলবে কি করে? বৃষ্টির ছাঁট লেগে এতক্ষণ শীত লাগেনি, এবার হঠাৎ শিউরে উঠল রানার সর্বশরীর। কাঁধের ওপর হাত রাখল আলতাফ। মুখে মৃদু হাসি।

'এতে কিছু এসে যায় না, রানা। বয়ে নিয়ে যাবার বোঝা তো কমল। ভেবে দেখো, ক্লান্ত ক্যাপ্টেন মিশ্রী খান কত খুশি হবে এই বোঝা হালকা হয়ে যাওয়ায়!'

এমন সময় তীক্ষ্ণ একটা শব্দে একসাথে চমকে উঠল আলতাফ ও

রানা। ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং বেজে উঠেছে টেলিফোন। শক্ত হয়ে গেল রানার মুঠি, আড়ষ্ট হয়ে শুনল সে টেলিফোন রিং। তারপর এগোতে গিয়েও থেমে দাঁড়াল। ফিরল আলতাফের দিকে।

'মত পরিবর্তন করলে?' জিজ্ঞেস করল আলতাফ।

মাথা ঝাঁকাল রানা। মুখে কিছুই বলল না। আলতাফই বলল, 'উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত বাজতেই থাকবে। যখন কিছুতেই উত্তর পাবে না তখন আসবে ওরা, এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'ভেবে দেখলাম ওই ঝুঁকিটা আমাদের নিতেই হবে। কিন্তু কতক্ষণ লাগবে ওদের পৌঁছতে সেটাই প্রশ্ন।' চারদিকে একবার চোখ বুলাল রানা। 'টেলিফোন ধরা ঠিক হত না। ধরা পড়ে যাবার শতকরা পঁচানব্বই ভাগ সম্ভাবনা। হয়তো গলার স্বরে ধরা পড়ব, কিংবা ভাষায় ধরা পড়ব, কিংবা হয়তো কোড সিগন্যালে ধরা পড়ব- কিন্তু বোঝার উপায় নেই ধরা পড়েছি কিনা। তাছাড়া মিশ্রী আর মাহবুব ছাড়া সবকিছু উঠে এসেছে আমাদের। কেউ জানে না যে আমরা পৌঁছে গেছি। সেন্ট্রিটাকে যখন পাওয়া যাবে না ওরা মনে করবে বেশি কিনারে চলে গিয়েছিল নিষেধ সত্ত্বেও এবং পা পিছলে পড়ে ডুবে গেছে সমুদ্রে। এখন ওদের দু'জনকে নিয়ে কেটে পড়তে পারলেই এই মিশনের প্রথম অর্ধেক সফল হয়।'

'হ্যাঁ। ঠিক বলেছ তুমি। এত কষ্টের পর যেটুকু অর্জন করেছি আমরা সেটুকু সামান্য ভুলে নষ্ট করার মত বোকামি আর নেই। কিন্তু এতক্ষণে ওরা রওনা হয়ে গেছে। ফোন থেমে গেছে। নিশ্চয়ই দৌড়ে আসছে ওরা এদিকে।'

আলতাফের কথা শেষ হবার আগেই দু'জনের চোখে পড়ল কয়েকটা টর্চ এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। প্রায় চার-পাঁচশো গজ দূরে আছে। চলার বেগে টর্চের আলো নাচানাচি করছে এদিক-ওদিক।

দ্রুত রশিটা নামিয়ে দিল আলতাফ। মিশ্রী খান উঠে এল ওপরে- অর্ধেকটা নিজের চেষ্টায়, বাকি অর্ধেক আলতাফের টানে। মাথাটুকু বেরোতেই থেমে গেল। রানা জিনিসপত্রগুলো সরিয়ে রাখছিল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে কিছুদূর নেমে বড় বড় কয়েকটা পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে। ফিরে আসতেই দেখল মিশ্রী খানের মাথা। অবাক হয়ে ঝুঁকে দেখল রানা দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বন্ধ করে আছে মিশ্রী খান।

'পৌঁছে গেছ, ক্যাপ্টেন। এবার উঠে পড়ো।' ওর কাঁধে দুটো চাপড় দিল রানা আস্তে করে।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইল মিশ্রী খান। তারপর আছড়ে-পাছড়ে উঠে পড়ল ওপরে। রানা অবাক হয়ে দেখল ওকে, রেইনকোট থাকা সত্ত্বেও ভিজে চুপচুপে ওর জামা-কাপড়। জিজ্ঞেস করল, 'ওপরে উঠে চোখ বন্ধ করে রেখেছিলে কেন?'

'ওপরে উঠে তো চোখ বন্ধ করিনি, ওস্তাদ!'

'তবে?'

'নিচেই চোখটা বন্ধ করে নিয়েছিলাম, ওপরে উঠে খুলেছি।'

'এই বিশ ফুট চোখ বন্ধ করে উঠেছ?'

'ঠিক তাই। ঝোলাঝুলির কারবারে আর যাব না বাবা, ভারি ভয় লাগে। একবার শিয়ালকোটে...'

'থাক, ক্যাপ্টেন, ওসব তোমার আত্মজীবনীর জন্যে সঞ্চয় করে রাখো। এখন ওই দেখো কারা আসছেন, আমাকে একটু সাহায্য করো মালপত্রগুলো সরাবার কাজে।'

অনেক কাছে চলে এসেছে প্রহরীগুলো। মাহবুব এখনও অর্ধেক উঠতে পারেনি। আলতাফ আর মিশ্রী খানকে সাব মেশিনগান নিয়ে তৈরি থাকতে বলল রানা নিচের ওই পাথরের আড়ালে। নিজে শুয়ে পড়ল মাটির ওপর। মাথাটা বের করে দেখছে সে মাহবুব কতটা এল। বিশ গজের মধ্যে এসে গেছে প্রহরীরা।

পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা এখন যদি মাহবুব ওপরে ওঠে তাহলে ঠিক ওদের হাতে গুলি খেয়ে মরতে হবে ওকে। মাহবুব যদি না-ও মরে প্রহরীগুলো প্রত্যেকে মরবে মিশ্রী আর আলতাফের হাতে। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল ওর মাথায়। দুই হাত মুখের কাছে এনে মৃদুস্বরে ডাকল একবার, 'মাহবুব!'

চট করে ওপর দিকে চাইল মাহবুব।

'নেমে যাও, মাহবুব! কয়েকজন সেন্ট্রি আসছে এদিকে। আমরা সরে যাচ্ছি, কাছেই লুকিয়ে থাকব। নিচে নেমে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকো মরা মানুষের মত। নেমে রশি ধরে দুটো টান দেবে, আমি উঠিয়ে নেব রশিটা।

বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে কথাগুলো বুঝবার চেষ্টা করল রক্তক্ষরণে দুর্বল, ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত মাহবুব। বুঝতে পারল। নেমে যাচ্ছে সে এখন। আর পনেরো গজ দূরেই সেন্ট্রিদের বুটের শব্দ। হঠাৎ হাত ছেড়ে দিল মাহবুব। ও যে কতখানি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে ধারণাই ছিল না রানার। দাঁতে দাঁত চেপে অপেক্ষা করল সে ভারি কিছু পতনের। বোধহয় কোনও শিকড়ে পা বেধে গেছে। মড়াৎ করে কিছু ভাঙার শব্দ পাওয়া গেল। বুকে হেঁটে সরে এল রানা উপড়ে যাওয়া বট গাছটার আড়ালে। আর অপেক্ষা করা যায় না। একবার পাঁচ ফুটের মধ্যে এসে পড়ল একটা টর্চের আলো। মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইল রানা আলোটা সরে না যাওয়া পর্যন্ত। রানা জানে ওর ওপর টর্চের আলো পড়া মানেই পাঁচটি সেন্ট্রির মৃত্যু। আর তাহলে ওদের আগমন আর গোপন থাকবে না কারও কাছে।

গাছের আড়ালে পৌঁছেই রশিটা উঠিয়ে ফেলল রানা, লুকিয়ে রাখল একটা ডালের নিচে।

এসে গেছে সেন্ট্রিরা।

পাঁচ

প্রথমেই টেলিফোনটা খুঁজে বের করল ওরা। ঘাঁটিতে ফোন করল। তারপর খুঁজতে আরম্ভ করল তন্ন তন্ন করে। আশে পাশে কোথাও ঘুমিয়ে আছে কিনা দেখবার জন্যে দু'জন গেল দুইদিকে। আর বাকি তিনজন সাগরের দিকটা দেখছে। একজন কিনার ধরে হাঁটছে, ওর কোমরের বেল্ট ধরে আরেকজন কিনার থেকে একটু দূরে। আর তৃতীয়জন দ্বিতীয়জনের হাত ধরে আছে শক্ত করে নিরাপদ দূরত্বে। টর্চ জ্বেলে ধীর পায়ে হাঁটছে প্রথম লোকটা। প্রতিটা পাথর পরীক্ষা করছে নিচের।

হঠাৎ থেমে দাঁড়াল প্রথমজন, কি যেন বলল। আরেকটু ঝুঁকে আলো ফেলে ভাল মত পরখ করবার চেষ্টা করছে সে কি যেন। রানা বুঝল কি দেখতে পেয়েছে লোকটা। শোল্ডার হোলস্টার থেকে ওয়ালথার পি. পি. কে. চলে এল ওর ডান হাতে। কেউ রাইফেল তুললেই অনিবার্য মৃত্যু ঘটবে তার।

বৃষ্টি আর হাওয়ার শব্দ ছাড়া পনেরো সেকেণ্ড আর কিছুই শোনা গেল না। তারপর পরিষ্কার কণ্ঠে কেউ বলল, 'হ্যাঁ, ওটা শ্রীধরেরই দেহ। বেচারা! আমি বারবার নিষেধ করেছিলাম ওকে যেন বেশি কিনারে না যায়, ফসকা মাটি এখানকার।' কয়েক পা পিছিয়ে এল সে কিনার থেকে। 'ওই দেখো। ওইখানটায় পা ফসকেছে, দাগ দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।'

রশির দাগটার ওপর টর্চ ফেলে দেখাল সে সাথীদের।

'মরে গেছে, না জ্যান্ত?' একটা কম্পিত কণ্ঠ শোনা গেল।

'ঠিক বলতে পারছি না, দেখো না, বুঝতে পারো কিনা?'

প্রত্যেকেই একবার করে দেখল মাহবুবের দেহটা। একজন বলল, 'ঠিকই বলেছেন, শ্রীধরই। আমার মনে হয় বেঁচে আছে, ওয়াটারপ্রুফটা একটু নড়ল মনে হলো।'

'বাতাসেও নড়তে পারে।'

'না, আমার মনে হয় বেঁচে আছে।'

'যাই হোক, আমাদের নামতে হবে নিচে। দড়ির সিঁড়ি আনতে হবে, ওই গাছটায় বেঁধে নামা যাবে, স্ট্রেচার লাগবে। চলো, হারি আপ্।'

'আমাদের একজন এখানে থাকলে ভাল হয় না?'

'না। একশো জন দাঁড়িয়ে থাকলেও ওর কোনও উপকারে আসবে না। চলো সবাই, কুইক।' একবার হুইস্ল দিয়েই এগোল ওরা যেদিক থেকে

এসেছিল সেই দিকে।

মিশ্রী খানকে চারদিকে নজর রাখবার আদেশ দিয়ে আলতাফ আর রানা রশি বেয়ে নেমে এল নিচে। পেন্সিল টর্চ জ্বেলে যা দেখল তাতে গুলিয়ে এল রানার গা-টা। নিজের অজান্তেই আপনা আপনি শিউরে উঠল একবার। একটা মোটা শিকড় আর খানিকটা উঁচু হয়ে থাকা চোখা পাথরের মধ্যে পড়েছে মাহবুবের ডান পা। সিঁড়ির মত তিনফুট চওড়া ধাপ থেকে পাঁচ ফুট উঁচুতে। ডান পায়ের হাঁটুর নিচটা বেকায়দা রকম উঁচু হয়ে আছে। সেই ভাঙা পায়ের ওপরই অজ্ঞান অবস্থায় ঝুলছে দেহটা। মাথার কাটা জায়গায় আবার জোর আঘাত লেগে রক্ত ঝরছে।

বুকের ওপর কান রেখে শুনল রানা দুর্বলভাবে হার্ট বিট হচ্ছে। আলগোছে পা-টা ছাড়িয়ে নামিয়ে আনল আলতাফ ঝুলন্ত দেহটা। পা-টা টেনে সোজা করবার চেষ্টা করল রানা। অস্ফুট একটা গোঙানির শব্দ বেরোল মাহবুবের মুখ থেকে। প্যান্টের পা গুটিয়ে ওপরে তুলে দিল রানা যত্নের সঙ্গে। হাড়টা ভেঙে বেরিয়ে এসেছে খানিকটা, মাংসের ভেতরের সাদা অংশ আর রক্ত দেখে দুই গাল কুঁচকে গেল রানার। আলতাফের মুখ থেকে বেরোল, 'ইশ্‌শ্!'

একবার পায়ের ওপর হাত বুলিয়ে রানা বলল, 'কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার, আলতাফ।' তারপর কি মনে করে ওপর দিকে হাত দিয়ে আপন মনেই বলে উঠল, 'হায়, খোদা! ওপরেও ভেঙেছে। হাঁটুর ওপরে। আলতাফ, ছেলেটার অবস্থা খারাপ।'

'এখানে তো কিছু করবার উপায় নেই, তাই না?'

'না, ওকে এখন ওপরে নেয়া দরকার। কিন্তু কিভাবে…'

'আমি নিয়ে যাব। আমার পিঠে বেঁধে দাও তুমি ওকে।'

'এই অবস্থায়? ভাঙা পা ঝুলছে শুধু চামড়া আর ছেঁড়াখোঁড়া পেশীর ওপর। মরে যাবে ছেলেটা!'

'ওকে ওপরে না তুললেও মরবে। তাই না?'

মাহবুবের দিকে চেয়ে রইল রানা কিছুক্ষণ। তারপর প্রতিধ্বনির মত বলল, 'ওপরে না তুললেও মরবে।'

ধীরে ধীরে উঠে গেল আলতাফ রশি বেয়ে। ভাঙা পা-টা ধরে থাকল রানা কিছুদূর পর্যন্ত, তারপর ছেড়ে দিল আস্তে করে। মাথাটা ঝুলে আছে একপাশে। বৃষ্টির পানির সাথে রক্ত মিশে টপটপ করে পড়ছে চিবুক বেয়ে।

দ্বারোকা পাঁচ মাইল দক্ষিণে। আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী পথ ধরে মাইল খানেক এসে থামল ওরা। থামতে হলো মিশ্রী খানের পীড়াপীড়িতে।

'এভাবে আর কিছুদূর গেলেই ছেলেটা মারা যাবে, ওস্তাদ। এক্ষুণি আমাদের কিছু করা দরকার।'

'সামনেই একটা গুহা পাব, মিশ্রী,' কাঁধের ওপর বোঝার ভারে অবনত রানা বলল হাঁপাতে হাঁপাতে। 'কিছু একটা করতেই হবে।'

গুহায় পৌঁছে শুইয়ে দেয়া হলো মাহবুবকে একটা চাদর পেতে ভেজা মাটির ওপর। রানা দেখতে যাচ্ছিল ভাঙা জায়গাটা, সরিয়ে দিল ওকে মিশ্রী খান।

'আমার ওপর ছেড়ে দিন, ওস্তাদ। আলতাফ, ওষুধের বাক্সটা খোলো, প্লীজ। আর বাইরে থেকে কিছু ডাল ভেঙে নিয়ে এসো সোজা দেখে।'

'তুমি পারবে, মিশ্রী?' রানার বুকের ওপর থেকে যেন একটা বোঝা নেমে গেল। হঠাৎ কেন যেন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল মনটা। কিছু একটা বলতে ইচ্ছে করল। বলল, 'কিন্তু ওর পা-টা কিভাবে...'

'দেখুন, ওস্তাদ!' অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলল মিশ্রী খান, 'সারা জীবন শুধু তিনটে জিনিস ঘেঁটেছি আমি। বারুদ, বারুদ আর বারুদ। বিশ্রী জিনিস এই বারুদ। শত শত হাত-পা ভাঙা লোক দেখেছি আমি। নিজের দলের হলে বেশির ভাগ নিজেই মেরামত করেছি। এসব আমার কাছে পানি।'

'ঠিক আছে।' মিশ্রীর কাঁধে চাপড় দিল রানা। 'ওকে তোমার হাতেই সোপর্দ করলাম।'

'ছোকরার প্রথম দরকার মরফিন।' বাচাল মিশ্রী খান কথা বলবার সুযোগ পেয়েছে। পেনসিল টর্চ জ্বেলে ওষুধের বাক্স থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস বাছতে বাছতে মুখ চলল ওর ফুল স্পীডে। 'হ্যাঁ, মরফিন না হলে চলবে না। সালফা দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দেব পা-টা। তারপর দরকার আশ্রয়, শুকনো কাপড়, খাবার।'

'শুকনো কাপড়, খাবার? কোথায় পাব?' রানার মনে পড়ল মাহবুবের বাঁধার দোষেই খাবার, স্টোভ সব খোয়া গেছে।

'কোথায় পাব জানি না, কিন্তু জোগাড় করতে হবে। নইলে ঠিক এই ভেজা শরীরে নিউমোনিয়া হয়ে যাবে ওর। আর পায়ে যদি একবার সেপসিস্ বা গ্যাংগ্রিন হয় তবে...' থেমে গেল মিশ্রী খান। কয়েকটা বেত কেটে এনেছে আলতাফ। সোজা ডাল পাওয়া যায়নি আশেপাশে। আলতাফ আর মিশ্রী খান ব্যস্ত হয়ে পড়ল মাহবুবের পা নিয়ে। রানা দেয়ালে হেলান দিয়ে দেখছে।

কী জীবন! মানুষ কখন কি অবস্থায় থাকে কেউ বলতে পারে? এই তিনদিন আগে মরিয়মের সাথে ফিটফাট এয়ার কণ্ডিশনড হোটেলে ডিনার খাচ্ছিল ধোপদুরস্ত কাপড় পরে, ঢাকায় বসে। আর আজ? কাদার মধ্যে বসে বসে ধুঁকছে- পেটের ভেতর চোঁ-চোঁ ছুঁচোর কেত্তন। ঢাকার পি. সি. আই. অফিসের কথা মনে হলো- মেজর জেনারেল রাহাত খানের ঋজু চেহারাটা মনে পড়ল। মনটা অনেক দূরে চলে গেল। বাইরে একটানা বৃষ্টির রিমঝিম।

ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করা হলো, টেনে বাঁধা হলো পা-টা। বেত দিয়ে

স্প্লিন্ট-এর কাজ সারা হলো। কাজ শেষ করে মাহবুবের পাশে শুয়ে পড়ে ফস্ করে ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে বগা সিগারেট ধরাল মিশ্রী খান।

'আল্লা! শরীরে আর দুব্বল পাচ্ছি না, ওস্তাদ। এই ছোকরাকে বাইরে থেকে দেখতে যেমন লাগছে, আমার ভেতরটায় সেই রকম বোধ করছি।' হঠাৎ কি কথা মনে পড়ায় উঠে বসল সে। সুর বদলে বলল, 'এখানেই রাতটা কাটাবেন নাকি, ওস্তাদ?'

'হ্যাঁ, গুহাটাকে রাত্রিবাসের উপযুক্ত করে গুছিয়ে নিতে হবে।'

'কিন্তু...' ইতস্তত করল মিশ্রী খান।

'কি ব্যাপার?' কেন যেন রানার মনে হলো কোনও দুঃসংবাদ আছে।

'দুঃসংবাদ আছে, ওস্তাদ। বলি বলি করেও বলা হয়নি এতক্ষণ।'

'এখন ভণিতা না করে বলে ফেলো ঝট্‌পট্,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল রানা।

'যে লোকটাকে আপনারা চ্যাং দোলা করে সাগরে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন, মনে আছে? বাম ধারের দুটো পাথরের মধ্যে আটকে আছে ওর দেহটা।'

'আচ্ছা! এই জন্যেই তোমার ওয়াটারপ্রুফের তলাতেও সমস্ত কাপড় ভেজা?'

'চার-পাঁচবার চেষ্টা করলাম, ওস্তাদ, কোমরে রশি বেঁধে ধরে রেখেছিল মাহবুব। কিন্তু প্রতিবারেই শালার ঢেউগুলো এক ধাক্কায় নিয়ে আসে তীরে।'

দশ সেকেণ্ড চুপচাপ চিন্তা করল রানা। তারপর বলল, 'এখন দশটা বাজে। কাল সকালেই ওরা জানতে পারবে যে আমরা ঢুকে পড়েছি ওদের এলাকায়, মাঝের এই সময়টা আমাদের কাজে লাগাতে হবে। সকাল বেলাই ওরা দেখতে পাবে লাশ। ওর হৃৎপিণ্ড বরাবর আলতাফের ছুরির দাগও দেখতে পাবে। কাজেই আধঘণ্টার মধ্যে রওনা হব আমরা। হাফ অ্যান আওয়ার রেস্ট।'

আবার ক্লান্তিকর পথ চলা। মাহবুবকে তুলে নিয়েছে আলতাফ আগাগোড়া দুটো রেইনকোটে মুড়ে। রানা তুলে নিল কাঁধের ওপর প্রকাণ্ড একটা বোঝা।

'আমি আলতাফের আগে আগে পথ দেখিয়ে চলি, তাহলে গর্তে পা পড়বার ভয় থাকবে না,' বলল মিশ্রী খান। হেঁইও বলে মালপত্র কাঁধের ওপর তুলেই বুঝল কতখানি দুর্বল হয়ে পড়েছে শরীর। চট্ করে যোগ করল, 'প্রথম কিছুদূর। তারপর আমাদের দু'জনকেই বয়ে নিয়ে যেতে হবে ওর।'

আরও দুই মাইল দক্ষিণে সরে এল ওরা পাহাড়ী পথের খাড়াই-উতরাই ভেঙে। তারপর বেশ কিছুদূর পুবে এগিয়ে আরেকটা গুহা পেল পাহাড়ের অনেকটা ওপরে। পরিষ্কার মনে আছে রানার কমোডোরের আঁকা নক্সা। বুঝল, আর মাইল দুয়েকের মধ্যেই লেফটেন্যান্ট আরীফের সাথে দেখা করবার জায়গা। কিন্তু ঘড়িতে বাজছে সাড়ে চারটা। এখন সে জায়গায় নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে না কাউকে। তাছাড়া এখন অতদূর যাবার শক্তিও নেই

আর।

পথের মধ্যে দুইবার থেমে আলতাফ পরীক্ষা করে দেখেছে এখনও নাড়ী চলছে কিনা মাহবুবের। গুহায় পৌঁছেই তাঁবুর ক্যানভাস টাঙিয়ে প্রবেশ পথটা ঢেকে ফেলা হলো। কোন মতে একটা বিছানা মত করে মাহবুবকে তার ওপর শুইয়ে দিয়েই ওরা তিনজন ভেজা মাটিতে শুয়ে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল।

যার-পর-নাই ধকল গেছে সারাদিন-সারারাত।

ছয়

কেন ঘুমটা ভাঙল বুঝতে পারল না রানা। কিসের শব্দ? ঘুমের কালো পর্দা ভেদ করে একটা শব্দ এসে পৌঁছেচে ওর অর্ধসচেতন মনের দুয়ারে। রোমাঞ্চ আর বিপদ নিয়েই রানার জীবন। এই সঙ্কেতের উপযুক্ত গুরুত্ব দিল সে। এক মুহূর্তে উঠে দাঁড়াল। সম্পূর্ণ সজাগ, সতর্ক সে এখন। এমনি সময় আবার শুনতে পেল সে শব্দটা। বহুদূর থেকে ভেসে আসছে উঁচু পর্দায় একটা হুইস্‌লের শব্দ। দুই সেকেণ্ড বেজেই থেমে গেল। ছোট-বড় অনেক পাহাড়ের গায়ে অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি উঠল।

রানার ক্রিস্টাল সেভেন সিটিজেন অটোমেটিক ঘড়িতে বাজে সাড়ে দশটা। ক্যানভাসের পর্দা সরিয়ে বাইরে চাইল সে। অন্ধকার হয়ে আছে এখনও আকাশটা। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে।

জেইস আইকন বিনকিউলারটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে গুহা থেকে।

পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশজন হবে। পার্বত্য সৈনিক। তন্ন তন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে এগোচ্ছে ধীর পায়ে ওরা যে-পথে এসেছে সেই পথ ধরে। অনেক দূর ছড়িয়ে। প্রত্যেকটা পাহাড়, টিলা খুঁজছে ওরা সাবধানে। আধ মাইলও হবে না।

দূরবীনটা চোখ থেকে নামাল রানা। হঠাৎ কাঁধে হাত পড়তেই চমকে ফিরে দেখল আলতাফ ওর পেছনে দাঁড়িয়ে হাসছে। বিনাবাক্য ব্যয়ে দূরবীনটা ওর হাতে দিল রানা। ওটা চোখে তুলে গম্ভীর হয়ে গেল আলতাফের মুখ। ফোকাস অ্যাডজাস্ট করে ভাল করে একবার দেখে নিয়ে বিনকিউলারটা নামাল সে চোখ থেকে।

'অবস্থা তো খুব খারাপ দেখা যাচ্ছে, রানা।'

'ওদের পার্বত্য ট্রুপ। এদের ফাঁকি দেয়ার উপায় নেই, খুঁজে বের করবেই এরা আমাদের।' মাথার পেছনটা চুলকাল রানা চিন্তিত মুখে। 'কিন্তু

এত তাড়াতাড়ি আমাদের উপস্থিতি জানতে পারল কি করে ওরা? কাল রাতেই বোধহয় সেই সেন্ট্রির মৃতদেহটা পেয়েছে সেপাইগুলো। ফিরে এসে যখন সাগর পারে মাহবুবের দেহটা দেখতে পায়নি, তখনই ওরা বুঝে নিয়েছে আমরা একজন আহত লোককে বয়ে নিয়ে যাচ্ছি, কাজেই খুব বেশি দূরে যেতে পারিনি এখনও। আগে হোক, পরে হোক ধরা পড়ছি আমরা।'

'বড়জোর এক ঘণ্টা। এই অবস্থায় মাহবুবকে ফেলে পালালে পালাতে পারি আমরা, ওকে নিয়ে গা ঢাকা দেয়া অসম্ভব।'

'কিন্তু পালাতেই হবে। এবং ওকে নিয়েই।'

'বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্রতর স্বার্থ বিসর্জন?' হাসল আলতাফ।

'তাই।'

'কিন্তু তুমি শুধু শুধু চিন্তা করছ, বন্ধু। চলো, ক্যাপ্টেন মিশ্রী খানকে চমকে দেয়া যাক সুখবরটা দিয়ে।'

ক্যানভাসের পর্দা তুলেই প্রথম চোখ পড়ল রানার মাহবুবের চোখে। ওর দিকে চেয়ে মৃদু হাসল রানা। বলল, 'যাক, জ্ঞান ফিরেছে তাহলে। এখন কেমন বোধ করছ, মাহবুব?'

রানার দিকে চেয়ে মৃদু হাসবার চেষ্টা করল মাহবুব। রক্তশূন্য মুখে ঠোঁট দুটো সাদা দেখাল। রানা ভাবল, আহা, কার বাচ্চা না জানি। একেবারে অল্প বয়স বেচারার, অথচ কী দুর্ভোগই না ভুগছে।

'খুব খারাপ না,' বলল মাহবুব। কথা বলতে গিয়ে ব্যথায় কুঁচকে গেল মুখটা। ব্যাণ্ডেজ করা পায়ের দিকে চাইল সে একবার, তারপর সোজাসুজি রানার দিকে চেয়ে বলল, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, স্যার। বোকার মত এই কাণ্ডটা বাধিয়ে বসলাম।'

'এটা শুধু বোকামি নয়, গর্দভের মত কাজ হয়েছে। অমার্জনীয় অপরাধ। এবং এজন্যে একমাত্র দায়ী হচ্ছি আমি। তুমি কি পরিমাণ দুর্বল হয়ে পড়েছ, আমার বোঝা উচিত ছিল। দলের কে কেমন আছে খোঁজ নেয়ার দায়িত্ব ছিল আমারই ওপর।' মাহবুবের কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। 'আমাকে সেজন্যে মাফ করো, মাহবুব। সত্যিই আমি বুঝতে পারিনি তোমার অবস্থা।'

অস্বস্তি বোধ করল মাহবুব। কিন্তু মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল এই ভেবে যে কেউ এটা ওর দোষ মনে করছে না। খুশি হয়ে উঠল ওর মনটা ভেতর ভেতর। লজ্জিত হাসি হাসল সে। তারপর বলে ফেলল সেই কথাটা, যেটা অন্য সময় বা অন্য কারও কাছে কিছুতেই বলত না প্রাণ গেলেও।

'ব্যাপারটা দুর্বলতার জন্যে ঘটেনি, স্যার। আসলে খুব ভয় পেয়েছিলাম। অতিরিক্ত ভীতু আমি। প্রথম দিন থেকেই ভয়ে কুঁকড়ে আছি। ভয়েই হাত-পা অসাড় হয়ে গিয়েছিল আমার।'

সাইকো-অ্যানালিস্টের কাছে রোগী যেমন কিছুই গোপন রাখে না, সব

কথা বলে ফেলে, তেমনি ভাবে কথাগুলো বলে ফেলল মাহবুব। প্রথমটায় হতভম্ব হয়ে গেল রানা। তারপর মাহবুবের দিকে চেয়ে রহস্যময় হাসি হাসল।

'বুঝতে পারছি, তুমি এই মাঠে নতুন পিলিয়ার। তুমি হয়তো ভাবছ আমি হাসতে হাসতে গান গাইতে গাইতে চলেছি? ভাবছ আমি ভয় পাইনি?' চোখ সরু করে পাপড়ির মধ্যে দিয়ে চাইল রানা মাহবুবের দিকে। 'কেবল ভয় নয়, প্রতিটা মুহূর্ত আমার আতঙ্কিত বিভীষিকার মধ্যে কেটেছে। আলতাফেরও। মিশ্রীরও।'

'আলতাফ!' হাসল মাহবুব। হাসতে গিয়ে ভাঙা হাড় একটু নড়ে উঠতেই গোঙানি বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। সামলে নিয়ে বলল, 'আলতাফ? আতঙ্কিত? আমি বিশ্বাস করি না।'

'আলতাফ সত্যিই ভীত।' প্রকাণ্ড সিন্ধীর গলাটা গমগম করে উঠল গুহার মধ্যে। 'আলতাফ ভীতু বলেই এতদিন পর্যন্ত বেঁচে আছে। যারা ভয় পায় না, তারা মারা পড়ে অসাবধান থাকার জন্যে। এই যেমন ভয় না পেলে এখন রাইফেল নিয়ে বেরোতাম না। আর বাইরের ওই বন্ধুরা ভয় পায়নি বলে প্রাণ দেবে অকাতরে।'

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল মিশ্রী খান। এতক্ষণ চোখ বন্ধ করে এই সব আলাপ শুনছিল সে। এই কথায় চোখ বড় বড় করে চাইল। রাইফেলের ওপর একটা টেলিস্কোপিক সাইট লাগিয়ে ফেলেছে আলতাফ ইতিমধ্যেই।

'মাউন্টেন ট্রুপের পঁয়ত্রিশ-চল্লিশজন এদিকে আসছে। আমাদের খুঁজে বের করতে ওদের খুব বেশি বেগ পেতে হবে না।'

'চমৎকার!' উঠে বসল মিশ্রী খান। 'খুশির চোটে আমার নাচতে ইচ্ছে করছে। কতদূর ওরা, ওস্তাদ?'

'ঘণ্টা খানেক লাগবে পৌঁছতে,' বলল রানা।

'আগামী ষাট ঘণ্টার মধ্যে এই গুহার কাছাকাছি আসতে পারবে না ওরা,' বলল আলতাফ। 'ওদের বিভ্রান্ত করে দিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাব আমি। আমি একটু ঘুরে আসতে পারি, মেজর?'

রানা বুঝল এছাড়া আপাতত আর কোনও উপায় নেই। এই অবস্থায় মাহবুবকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে নির্ঘাৎ মারা যাবে ছেলেটা। মাথা ঝাঁকাল সে।

'সন্ধ্যার আগে তো ফেরা যাবে না। তোমরা কি এখানেই থাকবে?' জিজ্ঞেস করল আলতাফ।

'সবাই যদি নাও থাকি, কেউ না কেউ থাকবে।'

মিশ্রী খান চেপে ধরল আলতাফের হাত। বলল, 'খোদাকা ওয়াস্তে, নিজের দিকে লক্ষ রেখো, আলতাফ।'

'আমার জন্যে চিন্তা করো না, মিশ্রী। ওই বেচারাদের জন্যে প্রার্থনা

করো খোদার কাছে। ওরা বড় ভুল পথে এসেছে আজ।' চলে গেল আলতাফ মৃদু হেসে।

'স্যার!' মাহবুবের দুর্বল কণ্ঠ শোনা গেল। এগিয়ে গেল রানা ওর কাছে। 'স্যার, যদি অপরাধ না নেন তবে একটা কথা বলি। আমি অকৃতজ্ঞ নই, তাছাড়া হিরো হবারও চেষ্টা করছি না, কিন্তু…কিন্তু এটা ঠিক, আমি আপনাদের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছি এখন, আপনাদের কাঁধের ওপর চেপে বসেছি সিন্ধুবাদের সেই…'

'তাই তোমাকে ছেড়ে চলে যাব, এই তো?' বাধা দিল রানা। 'ওসব কথা ভুলে যাও, মাহবুব। তোমাকে শত্রুদের হাতে তুলে দিয়ে পালানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। সেজন্যে দুঃখিত।'

'কিন্তু…কিন্তু স্যার…'

'তুমি আমাদের অপমান করছ, মাহবুব,' মিশ্রী খান বিশ্রী করে হাসল। 'তাছাড়া আমি তো আমার পেশেন্ট ভাল না হওয়া পর্যন্ত তাকে হাতছাড়া করতে পারি না।'

মাহবুবকে অবাক হয়ে চাইতে দেখে রানা বলল, 'ওহ-হো, ডাক্তার আর রোগীর পরিচয়ই তো হয়নি এখনও। শোনো, মাহবুব, ইনি হচ্ছেন ডক্টর মিশ্রী খান। আপাতত ওঁরই চিকিৎসাধীনে আছ তুমি। তোমার পায়ের ব্যাণ্ডেজ আর স্প্লিন্ট ওঁরই বাঁধা।'

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মিশ্রীর দিকে চেয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল মাহবুব। হাত তুলে থামবার ইঙ্গিত করল মিশ্রী খান।

'আর কোনও কথা নয়। এখন রি-ড্রেস করতে হবে। মনটাকে শক্ত করে নাও, ভাতিজা। তেমন কিছু লাগবে না। আগে এই ওষুধটা খেয়ে নাও। পায়ের অবস্থাটা একবার চেক করে দেখা দরকার।'

পাঁচ মিনিটে জ্ঞান হারাল মাহবুব। ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রানার দিকে ফিরল মিশ্রী খান।

'ছেলেটা মারা যাচ্ছে, ওস্তাদ। কমপক্ষে একশো চার ডিগ্রী জ্বর ওর গায়ে, পালস্ বিট একশো বিয়াল্লিশ। এক্ষুণি হাসপাতালে দেয়ার ব্যবস্থা না করতে পারলে আর বড়জোর আটচল্লিশ ঘণ্টা টিকবে। ওর অবস্থা আমার ক্ষমতার বাইরে। আমি সালফা দিয়ে বেঁধে দিলাম, কিন্তু সেপ্‌সিস্ ঠেকাতে পারব না। এখন কি করা যায়, ওস্তাদ?'

'আপাতত কিছুই করবার নেই।'

'এই গুহা থেকে আমরা সরে যাচ্ছি কখন?'

'খুব সম্ভব আজই রাতে।'

'ওকে নিয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক মরে যাবে।'

'মারা গেলে ওকে ফেলে রেখে এগোতে পারব আমরা, কিন্তু তার আগে নয়।' রানার মুখটা কঠোর দেখাল। 'মাহবুব আমাদের প্ল্যান জানে। ভারতীয়রা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছে আমরা এখানে ঘাস কাটতে আসিনি। কিন্তু ওরা জানে না কিভাবে আমরা কাজ উদ্ধার করতে যাচ্ছি। কিন্তু মাহবুব জানে। ওকে যদি ভারতীয়দের হাতে ফেলে রেখে যাই, সব কথা বলতে বাধ্য করবে ওকে ওরা। স্কোপোলামিন ট্রুথ সিরাম পড়লে যে কেউ কথা বলতে বাধ্য।'

'আধমরা ছেলেটার ওপর স্কোপোলামিন!' অবিশ্বাসের ভাব মিশ্রীর মুখে।

'কেন নয়? তুমি বা আমি হলেও তাই করতাম। এতবড় একটা নৌঘাঁটির নিরাপত্তার জন্যে এটুকু করাটা কিছুই নয়।'

'বুঝলাম, ওস্তাদ। এরই জন্যে ওকে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছি আমরা। নিজ হাতে খুনও করতে পারছি না, আবার কোথাও ফেলে রেখেও পালাতে পারছি না। অথচ বেচারা ভাবছে আমরা ওর কত বড় মঙ্গলাকাক্ষী- কত ভালবাসি ওকে আমরা! ওর বিপদে আমরা নিজেদের নিরাপত্তা তুচ্ছ করেও ওকে বাঁচাবার কি আপ্রাণ চেষ্টা করছি। ছিঃ! একটা মুমূর্ষু বাচ্চা ছেলের এই সরল বিশ্বাসে নিজেকে বড় ছোট মনে হচ্ছে, ওস্তাদ। ঘেন্না লাগছে নিজের ওপর।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল রানা মিশ্রী খানের মুখের দিকে। পরিষ্কার দেখতে পেল সে একজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধার কোমল মনটা। নিজের মনের সাথে সে-ই কি কম যুদ্ধ করেছে গত রাত থেকে? কিন্তু কঠিন কর্তব্যের কাছে স্নেহ মমতা ভালবাসার কোনও স্থান নেই। এ-কথাটা মিশ্রীও জানে। তাই তাকে কিছুই বোঝাবার চেষ্টা করল না সে। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকাল বাইরের দিকে।

'টাশ্, টাশ্, টাশ্!' রাইফেলের গুলির শব্দ পাওয়া গেল। তারপর আবার তিনটে আওয়াজ। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর এলোপাথাড়ি শব্দ আরম্ভ হলো। শত্রুপক্ষও এবার গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করেছে।

ঘণ্টা খানেক পর এক-আধটা শব্দ পাওয়া গেল বহু দূর থেকে। রানা বুঝল বিপদ কেটে যাচ্ছে ক্রমে।

'ওস্তাদ!' ডাকল মিশ্রী খান আস্তে করে।

'বলো,' থেমে দাঁড়াল রানা সূচীভেদ্য অন্ধকারে। তিনহাত দূরেও কিছু ঠাহর করা যাচ্ছে না। ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলেছে ওরা।

'আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন?'

'সে বয়স আমার পার হয়ে গেছে। কেন, ভয় লাগছে নাকি?'

'কিসের যেন শব্দ শুনলাম, ওস্তাদ!' কানের কাছে ফিসফিস করে বলল মিশ্রী খান।

'ওটা মনের ভুল।'

'না, ওস্তাদ, অস্পষ্ট মত যেন শুনলাম মানুষের গলা। দু'জন কথা বলছে।'

'অসম্ভব। এখনও আধমাইল আছে সেই ডাকবাংলো। বাদলার রাতে এই জঙ্গলের মধ্যে কে আসবে?'

এখানে ওখানে টুপ-টাপ পানি পড়ছে ঝরা পাতার ওপর। রানার বাম হাতটা ধরে ফেলল মিশ্রী খান। রানা বুঝল ভয় পেয়েছে মিশ্রী খান।

'সেজন্যেই তো ভাবছি, মানুষ না। জিন-টিন হতে পারে।'

চুপচাপ বেশ কিছুদুর এগোল ওরা। হঠাৎ মিশ্রী খান বলল, 'ওস্তাদ, ক্যাপ্টেন আলতাফ কি বেঁচে আছে এখনও?'

'কেন? তুমি কি ভাবছ আলতাফের ভূতই পিছু নিয়েছে আমাদের?' একটু হাসল রানা। মিশ্রী খানের কাঁধের ওপর হাত রাখল। 'এত সহজে মরবে না আলতাফ। ও হচ্ছে পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ গেরিলা ফাইটার।'

'তবু ওকে একা এভাবে যেতে দেয়া আপনার ঠিক হয়নি।'

'ভালমন্দ বোঝার ক্ষমতা তোমার-আমার চাইতে ওর অনেক বেশি আছে। তুমি হয়তো জানো না, আর্মিতে ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল ছিল।'

'কি বললেন?' চমকে উঠল মিশ্রী খান। 'আমি তো জানতাম ক্যাপ্টেন...'

'ডাবল ডিমোশন হয়েছিল ওর। বর্ডারে ওর বাড়ি। রান অফ কাচের যুদ্ধের সময় ওর বাবা-মা, স্ত্রী এবং তিন ছেলেকে ভারতীয় সৈন্যরা ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল। খবরটা কানে যেতেই ছদ্মবেশে চলে গিয়েছিল সে শত্রু লাইনের পেছনে। ছয় মাস নিরুদ্দেশ থেকে এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী প্রত্যেকটা লোককে খুঁজে বের করে নির্মম প্রতিশোধ নিয়েছিল সে। যখন পাকিস্তানে ফিরে এল তখন চেহারা আর চেনা যায় না- হাড় ক'খানা আছে শুধু শরীরে। অ্যারেস্ট করা হলো ওকে সেনাবাহিনী থেকে পালানোর অপরাধে, বিচারে ডাবল্ ডিমোশন হলো। এমন সময় আমাদের চীফ সমস্ত ঘটনা জানতে পেরে ওকে নিয়ে এলেন পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে। এখন বুঝতে পারছ, ভালমন্দ বোঝার ক্ষমতা ওর এত বেশি কেন?'

মিশ্রী খান এতক্ষণ মনে মনে তলিয়ে দেখে বুঝল কেন রানা বিশেষ সম্মানের সঙ্গে কথা বলে ক্যাপ্টেন আলতাফের সঙ্গে, কেন ওর মতামতের এত দাম দেয়, কখনও কেন হুকুমের সুরে আদেশ দেয় না, অনুরোধ করে। চুপচাপ বেশ কিছুদূর চলে গেল ওরা। হঠাৎ রানার আস্তীন ধরে টান দিল মিশ্রী খান।

'ওস্তাদ! আবার শুনলাম!'

হেসে ফেলল রানা। পরমুহূর্তেই সতর্ক হয়ে গেল ওর সজাগ মন।

বলল, 'সত্যি শুনেছ তুমি? কোন্‌দিক থেকে এল শব্দটা?'

'বামদিক থেকে!' গলাটা কেঁপে উঠল মিশ্রী খানের। অদ্ভুত মানুষের চরিত্র। সামনা-সামনি যুদ্ধক্ষেত্রে যে লোক বীরের মত যুদ্ধ করতে পারে, রাত্রির অন্ধকারে সেই লোকই শিশুর মত ভূতের ভয়ে আতঙ্কিত। শিশুকাল থেকেই ভয়টা মজ্জার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় আমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মায়েরা। কিন্তু রানার মন এইসব গবেষণায় একবিন্দু সময়ও নষ্ট করল না। মাথায় চলছে ওর দ্রুত চিন্তা। তিন সেকেণ্ডেই প্ল্যান ঠিক করে ফেলল সে। মিশ্রী খানকে বুঝিয়ে বলতেই ভূতের ভয় কেটে গেল ওর। কিছুদূর এগিয়ে চট্‌ করে একটা গাছের আড়ালে সরে গেল রানা, আর কৌশলে দু'জনের পায়ের শব্দ করতে করতে এগিয়ে গেল মিশ্রী খান সামনের দিকে।

আক্রমণটা এল পেছন থেকে। প্রায় হুড়মুড় করে ওর ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল লোকটা। ধাঁই করে রানার কনুইয়ের গুঁতো পড়ল ওর পেটের ওপর, সোলার প্লেক্সাসে। নিঃশব্দে পড়ল লোকটা মাটিতে। পিস্তলের বাঁটটা প্রচণ্ড জোরে ওর মাথায় মারতে গিয়েও সামলে নিল রানা। সোজা ধরে থাকল সেটা লোকটার বুকের দিকে। কিন্তু নড়ল না লোকটা। এত সহজেই অজ্ঞান হয়ে গেল? সাবধানে এক পা এগিয়ে ওর হাঁটুর ওপর মাঝারি রকম একটা লাথি দিল রানা বুট দিয়ে। এটা একটা পুরানো কৌশল। জ্ঞান থাকলে নড়ে উঠতেই হবে। কিন্তু একটুও নড়ল না ধরাশায়ী দেহটা। হাঁটু গেড়ে বসল রানা পাশে। হুড লাগানো একটা পেনসিল টর্চ জ্বেলেই চমকে উঠল সে। লেফটেন্যান্ট আরীফ! এরই সাথে দেখা করতে চলেছে ওরা।

সাত

সতেরো-আঠারো বছরের বাচ্চা ছেলে একটা। দাড়ি গোঁফ ওঠেনি এখনও। মেয়েলী চেহারা। লম্বায় পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি হবে। এত অল্প বয়সী ছেলের ওপর কমোডোর এত গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়েছেন দেখে বিস্মিত না হয়ে পারল না রানা। কালো একটা রেইনকোট পরনে, পায়ে গাম বুট। বাম হাতের কব্জিতে বড় সাইজের বেমানান ঘড়ি। মাথার হুডটা চিবুকের নিচে বেল্ট দিয়ে বাঁধা। একটা ক্যানভাসের ব্যাগ ঝুলছে কাঁধ থেকে। আঙুলের নখগুলো বড় বড়।

জ্ঞানহীন দেহটা উপুড় করে বগলের তলা দিয়ে হাত দিয়ে ঢুকিয়ে টেনে দাঁড় করাল রানা। তারপর নিয়ে এল রাস্তার ওপর। একটা সাঙ্কেতিক শিস দিতেই ছুটে এল মিশ্রী খান।

মিনিট দু'য়েক পর নড়ে-চড়ে উঠল লেফটেন্যান্ট আরীফের দেহটা।

চোখের পাপড়ি কেঁপে উঠল প্রথমে, তারপর পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল সে। চোখের ওপর টর্চের আলো পড়ায় চোখ ছোট করল ভুরু কুঁচকে।

'ওস্তাদ, এ যে দুধের বাচ্চা! এই ছোকরার কাছেই যাচ্ছিলাম আমরা?'

'কে তোমরা?' মেয়েলী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল লেফটেন্যান্ট আরীফ।

'তুমি যাদের খুঁজতে বেরিয়েছ আমরা সেই লোক, লেফটেন্যান্ট আরীফ। কিন্তু আমাদেরই তোমার সঙ্গে দেখা করবার কথা- তুমি চলেছিলে কোথায়?'

'তোমাদের গ্রুপের কোড সিগন্যাল বলো আগে।'

'ডেলায়লা।'

'আপনি কি মেজর মাসুদ রানা?' উঠে বসল আরীফ।

'হ্যাঁ, তাই। আমার প্রশ্নের জবাব দাও, আরীফ।'

'গোলাগুলির আওয়াজ শুনে বুঝতে পেরেছিলাম আপনারা পৌঁছে গেছেন। অথচ সকাল থেকে অপেক্ষা করছি, কারও দেখা নেই। তাই যাচ্ছিলাম আপনাদের বর্তমান অবস্থা জানবার জন্যে। আপনি বWড জোরে মেরেছেন আমাকে।'

'আমাদের খুঁজে পেতে কি করে?'

'এখানকার প্রতিটা পাহাড়, প্রতিটা গুহা আমার নখদর্পণে।' ডান পা-টা ভাঁজ করে সোজা করল একবার। 'হাঁটুটা ব্যথা করছে কেন?'

স্পড়ে গিয়েছিলে বেকায়দা মত,' অম্লান বদনে মিথ্যে কথা বলল রানা।

'গুলি কোরো না, নাজির। এরা আমাদের লোক,' হঠাৎ বলে উঠল আরীফ।

বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়াল রানা। দেখল পেছনে মিশমিশে কালো একটা ছায়া মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। টর্চের আলো পড়তেই চক্‌চক্‌ করে উঠল ওর হাতের রিভলভারটা।

'এই লোক কে?'

'ওর নাম নাজির বেগ, আমার সহকারী। কমোডোর জুলফিকার পাঠিয়েছেন ওকে বছর খানেক আগে। ওর সামনে সব কথা বলতে পারেন। যাক্‌,' উঠে দাঁড়িয়ে বার কয়েক পা-ঝাড়া দিল আরীফ। 'এখন কি প্ল্যান? আর দু'জন কোথায়?'

'প্রথম দরকার এখন খাবার। কাল দুপুরের পর থেকে আমরা কেউ কিছু খাইনি।'

'খাবার আমার সঙ্গে আছে।' ক্যানভাসের ব্যাগটা দেখাল আরীফ।

'তারপর দরকার ওষুধ, ব্যাণ্ডেজ আর শুকনো কাপড়।'

'ওষুধ, ব্যাণ্ডেজ কেন?'

'আমাদের মধ্যে একজন সা`ঘাতিক রকম জখম হয়েছে। খুব সম্ভব বাঁচবে না।'

'নাজির!' হুকুম করল আরীফ। 'গ্রামে ফিরে যেতে হবে তোমাকে। যেখান থেকে পারো ওষুধ, ব্যাণ্ডেজ আর শুকনো কাপড় জোগাড় করে আনো।'

গুহাটা চিনিয়ে দিল রানা। কি ভেবে আরীফ জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা ঠিক পথ চিনে ফিরতে পারবেন তো?'

'আশা তো করি। কেন?'

'সন্দেহ যখন আছে তখন আমাকে যেতে হবে আপনাদের সঙ্গে। ভাবছিলাম নাজিরের সঙ্গে একজন থাকলে জিনিসগুলো জোগাড় করতে সুবিধে হত ওর।'

'আমি যাচ্ছি ওর সঙ্গে,' বলল মিশ্রী খান। 'সেই সাথে খানিকটা ব্যায়াম-ও হয়ে যাবে।'

নাজির বেগ আপত্তি করল। বলল একাই পারবে সে। কিন্তু মিশ্রী খান ছাড়ল না। বলল, 'দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।'

মিশ্রী খান আর নাজির বেগ রওনা হয়ে যেতেই রানারাও এগোল। রানাদের আকস্মিক ভাবে পেয়ে গিয়ে মানসিক উদ্বেগের অবসান হয়েছে আরীফের। খুশি মনে চলল সে বকর বকর করতে করতে। শত্রু এলাকার মধ্যে সর্বক্ষণ কতখানি অনিশ্চয়তা আর বিপদের ভেতর ভয়ে ভয়ে সাবধান থাকতে হয়, সেই গল্প। একবার প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল- নাজিরকে তো নিয়েই গিয়েছিল। দু'জন সৈন্যকে খালি হাতে খুন করে প্রাণ নিয়ে ফিরেছে নাজির বেগ। লুকিয়ে দুই-দুইবার ঢুকেছে সে দ্বারোকা দুর্গের মধ্যে। প্রতিটা জিনিস ওর মুখস্থ। কোথায় কন্ট্রোল রূম, কোথায় ব্যারাক, কোথায় অফিসারস কোয়ার্টার, সেন্ট্রি পোস্ট, সবকিছু দেখে এসেছে। একবার তো পুরো একটা রাত ছিল সে দুর্গের মধ্যে।

খুশি হয়ে উঠল রানার মন। খুবই কাজে আসবে তাহলে লোকটা।

'তোমার সহকারীটা একটি রত্ন দেখতে পাচ্ছি!'

'আশ্চর্য রত্ন। কিন্তু ভারতীয়দের প্রতি এতখানি বিতৃষ্ণ লোককে বোধহয় এখানে পাঠানো ঠিক হয়নি। ভারতীয় সৈন্যরা জুনাগড়ে নাকি ওর পরিবারের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করেছিল, ওর চোখের সামনে হত্যা করেছিল ওর স্ত্রীকে, ওকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে চাবুক মেরে সারাদেহ জর্জরিত করেছিল। ফেলে রেখে দিয়েছিল শকুনে ছিঁড়ে খাবার অপেক্ষায়। আশ্চর্য ভাবে বেঁচে গেছে ও। তারপর থেকে প্রতিশোধ নিয়ে চলেছে সুযোগ মত। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, কী ভয়ঙ্কর সে প্রতিশোধ। ভারতীয় সৈন্য দেখলেই মাথায় খুন চেপে যায় ওর। অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায় ও, নিঃশব্দে পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়, পিঠের ওপর বসিয়ে দেয় ছুরি। টুঁ শব্দ করার আগেই শেষ। অসংখ্য খুন করেছে ও। জীবনের কোনও আনন্দ ওর কাছে এর চেয়ে বড় নয়।'

শিউরে উঠল একবার লেফটেন্যান্ট আরীফ নিজেই নাজির বেগের কথা ভেবে।

'আমাকে ও খুব মানে। আমার বাবা ছিলেন জুনাগড়ের মস্ত বড় জমিদার। সব লুটে-পুটে নিয়েছে হিন্দুরা রায়টের সময়। আমি বাবার একমাত্র সন্তান। ও নাকি আমাদেরই প্রজা ছিল। আমি অবশ্য দেখিনি ওকে কোনদিন।'

'তুমি কলেজ ছেড়েছ কবে?'

'বি. এস. সি. পাস করে আর পড়িনি, এই চাকরিতে ঢুকে পড়েছি। দেখতে কম মনে হলেও আসলে বয়স আছে আমার।'

খানিকক্ষণ নীরবে হাঁটল রানা। খাড়াই উতরাই ভেঙে অন্ধকার রাতে চলতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে।

'আমি কিছুই চিনতে পারছি না, আরীফ। কোন্‌দিকে চলেছি আমরা? আর কতদূর?'

হেসে উঠল আরীফ।

'আর মাত্র দু'শ গজ আছে। অন্য রাস্তায় নিয়ে এসেছি!' আবার হাসল। 'আপনাকে আপনারই আস্তানায় নিয়ে চলেছি আমি, অথচ আপনার চেহারাটা একবারও দেখিনি। এখন পর্যন্ত আপনার গলার স্বর ছাড়া কিছুই চিনি না। আশ্চর্য লাগছে ভাবতে। কয়েকটা কোড ওয়ার্ড মানুষের মধ্যে কি অদ্ভুত বাঁধন সৃষ্টি করে দেয়! কিন্তু আমাকে চিনলেন কি করে আপনি?'

'তোমার ছবি আর ডোশিয়ে দেখেছি আমি করাচিতে।'

'ও।' কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, 'আপনার গলার স্বর শুনে আপনার চেহারাটা মনে মনে কল্পনা করে রেখেছি আমি। গুহায় পৌঁছে মিলিয়ে দেখব মেলে কিনা। আমার মনে হয় ঠিক মিলে যাবে।'

এই ছেলেমানুষী খেলায় মজা পেল রানাও। একঘেয়ে হাঁটার চেয়ে মনে মনে এইসব খেলায় দোষের কিছু নেই।

'মিলল কিনা আমি বুঝব কি করে? বলো শুনি, কেমন দেখতে আমি?'

'বয়স পঞ্চান্ন। গাল দুটো বসা, কপালে ভাঁজ, ভুরু জোড়া কাঁচাপাকা! এক মুঠো দাড়ি আছে চিবুকে।' আবার খানিক ভেবে বলল, 'টুপির নিচে মাথা ভর্তি চকচকে টাক আছে।'

নিজের চেহারার এই বর্ণনা শুনে খুশি হতে পারল না রানা। চুপ করে রইল সে।

'কি, মিলেছে না?' জিজ্ঞেস করল আরীফ উৎসাহিত কণ্ঠে।

'ঠিক মিলে গেছে!' তৃতীয় এক ব্যক্তি কথা বলে উঠল। থমকে দাঁড়াল ওরা দু'জনেই। হো-হো করে হেসে উঠল আলতাফ। কাঁধে রাইফেল ঝুলানো।

'আলতাফ! তুমি…তুমি ফিরলে কখন?' বিস্মিত রানা জিজ্ঞেস করল।

'ব্যাটাদের পুব দিকে ভাগিয়ে দিয়ে আধঘণ্টা আগে ফিরে এসে পাহারা দিচ্ছি। ইনি নিশ্চয়ই লেফটেন্যান্ট আরীফ? মিশ্রী কোথায়?'

'ও গেছে ওর রোগীর জন্যে ওষুধপত্র আর শুকনো কাপড় জোগাড় করতে।'

'ফিরবে কি করে? ওর তো অসম্ভব ভূতের ভয়।'

'সাথে লোক আছে।'

সাবধানে ক্যানভাস সরিয়ে গুহায় ঢুকে পড়ল তিনজন। আলো জ্বলছে ভেতরে। গুহায় ঢুকে মোমবাতির আলোয় রানাকে আপাদমস্তক একবার দেখেই ভয়ানক লজ্জা পেয়ে গেল আরীফ।

'মাফ করবেন, মেজর রানা। কণ্ঠস্বর শুনে আমি ভাবতেও পারিনি যে আপনি আমার চেয়ে মাত্র চার-পাঁচ বছরের বড়। দাড়িও নেই, টাকও নেই। হেরে গেছি আমি।'

কোনও জবাব না দিয়ে প্রথমেই মাহবুবের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। জেগেই আছে সে। খুব দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে। চোখ দুটো লাল। বলল, পায়ে আর কোনও বোধ নেই, ব্যথাও নেই। রানা বুঝল লক্ষণটা খুবই খারাপ। মিশ্রী খান এখন তাড়াতাড়ি ফিরে এলে বাঁচা যায়। মাহবুবের গায়ে প্রবল জ্বর, কপালে হাত রাখা যাচ্ছে না। প্রমাদ গুণল রানা। ওকে এখান থেকে সরানোই একটা মস্তবড় সমস্যা হয়ে যাবে।

অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও কিছুই খেলো না মাহবুব। পাশ ফিরে ভাঙা ভাঙা অস্বস্তিকর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। মিশ্রী এবং মাহবুবের ভাগ আলাদা করে রেখে নিল খেয়ে রানা আর আলতাফ। খাবার শেষে ফ্লাস্কে করে আনা চা-টুকু মনে হলো যেন অমৃত। তৃপ্তির সঙ্গে কাপ শেষ করে উঠে দাঁড়াল রানা। রাত দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট। মাহবুবের রেডিয়ো ট্র্যান্সমিটার তুলে নিয়ে বলল, 'ওই পাহাড়ের মাথায় উঠে চেষ্টা করে দেখি স্যামসনকে পাওয়া যায় কিনা। আমার সাথে যে-কোনও একজন আসতে পারো। উঁচুতে উঠলে রিসেপশন ভাল পাওয়া যাবে।'

আলতাফ আর আরীফ দু'জনেই উঠে দাঁড়াল।

'একজন যেতে পারো, অপর জন থাকবে মাহবুবের কাছে।'

'ঘুমিয়ে পড়েছে মাহবুব। এই অল্পক্ষণের মধ্যে কিছুই হবে না ওর।'

'সেকথা ভাবছি না। কিন্তু কোন রকম ঝুঁকি নেয়া যাবে না। আমি চাই না ও ভারতীয় সৈন্যদের হাতে ধরা পড় ক। যে করেই হোক ওকে দিয়ে কথা বলাবে ওরা। সর্বনাশ হয়ে যাবে তাহলে।'

'তুমি মিছেই ভাবছ, মেজর রানা,' বলল আলতাফ। 'আশেপাশে এক মাইলের মধ্যে ওদের একটি প্রাণীরও চিহ্ন নেই।'

একটু ইতস্তত করে রাজি হয়ে গেল রানা। আস্তে করে ঝাঁকি দিতেই চোখ মেলে চাইল মাহবুব।

'আমরা একটু বাইরে যাচ্ছি। দশ মিনিটেই ফিরে আসব। কোনও অসুবিধে হবে না তো তোমার?'

'কি অসুবিধে? কিছু না। একটা রাইফেল রেখে যান আমার পাশে, আর বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে যান।' ট্র্যান্সমিটারের দিকে চেয়ে হাসল মাহবুব। 'ফিরে এসে ঢোকার সময় ডাক দিয়ে ঢুকবেন।'

আলো নিভিয়ে বেরিয়ে গেল ওরা তিনজন। তিনজন একসাথে না থাকলে পাহাড়টায় ওঠা মুশকিল হয়ে পড়ত। পরিষ্কার পাওয়া গেল করাচি। খবর শুনে চমকে উঠল সবাই। যুদ্ধের অবস্থা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। দ্বারোকা ঘাঁটি শেষ করতে না পারলে সমূহ বিপদ। সর্বশেষ সংবাদ, রওনা হয়ে গেছে পাকিস্তানী নৌবাহিনী।

ফিরে এসে আস্তে ডাকল রানা মাহবুবের নাম ধরে গুহামুখে। সাড়া নেই কোনও। আবার ডাকল। এবারও সাড়া নেই। ট্র্যান্সমিটারটা আলতাফের হাতে দিয়ে পিস্তল বের করল রানা।

বাম হাতে টর্চ। ঝট্ করে পর্দা সরিয়েই সেফটিক্যাচ্ আর টর্চের বোতাম একসাথে টিপল রানা।

চারদিকে ঘুরে এল আলোটা একবার। এবার ধীরে ধীরে প্রতিটা কোণা পরীক্ষা করল রানা। মেঝেটা পরীক্ষা করল।

এলোমেলো বিছানা পড়ে আছে। মাহবুব নেই।

আট

'তার মানে, ও তখন জেগেই ছিল,' আলতাফ বলল উত্তেজিত চাপাস্বরে।

'হ্যাঁ, জেগে ছিল। এবং আমার প্রত্যেকটি কথা শুনেছে ও। কেন ওর প্রতি আমাদের এত আগ্রহ, এত যত্ন, বুঝতে পেরেছে ও পরিষ্কার। ও যে আমাদের কাজে কতবড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা ওর আর অজানা নেই। ওর মনের মধ্যে কি তুফান যে বয়ে গেছে, কি প্রচণ্ড অভিমান উথলে উঠেছে ওর বুকের মধ্যে, ভাবতেও আমার···আলতাফ!' ঘড়ির দিকে চাইল একবার রানা। 'স্পনেরো মিনিটে বেশি দূর যেতে পারবে না ও, এই গুহার পঞ্চাশ গজের মধ্যেই আছে। চলো, তিনজন তিন দিকে যাব। খুঁজে বের করতেই হবে ওকে।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দুটো বড় বড় পাথরের মাঝখানে পাওয়া গেল মাহবুবকে। অজ্ঞান। এমন ভাবে লুকিয়েছিল যে পাথরের গায়ে রক্তের দাগ না দেখতে পেলে কিছুতেই বের করা যেত না।

অবলীলায় তুলে নিল আলতাফ ওকে, ফিরে এল গুহায়। খানিকটা

ব্র্যাণ্ডি খাওয়াবার চেষ্টা করল রানা ওকে- বেশির ভাগই পড়ে গেল কষা বেয়ে বাইরে। আলগা হয়ে যাওয়া বেতগুলো বেঁধে দিল রানা শক্ত করে। নাকে একটা গন্ধ আসতেই চমকে উঠল সে। মিশ্রী খান না আসা পর্যন্ত কিছুই বোঝা যাচ্ছে না ঠিক মত, কিন্তু রানা মনে মনে উপলব্ধি করল, মিশ্রী খানও কিছু করতে পারবে না এখন আর। কেউই কিছু করতে পারবে না। সময় পার হয়ে গেছে।

দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসে অপেক্ষা করছে রানা। তন্দ্রায় জড়িয়ে আসতে চাইছে দুই চোখ। অনেকক্ষণ পর চোখ তুলতেই দেখল এতক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে ছিল আরীফ ওর দিকে, ও চাইতেই চোখ সরিয়ে নিল।

'কিছু বলবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, ভাবছিলাম, দ্বারোকা পৌঁছবেন কি করে?'

'তোমার কোনও প্ল্যান আছে?'

'আশেপাশের প্রত্যেকটা গ্রামে আজ রাত থেকে সার্চ আরম্ভ হয়ে যাবে। আমার মনে হয় ভোর হওয়ার আগেই যদি আমরা রেল লাইনটা ক্রস করে পশ্চিমে চলে যেতে পারি তাহলে আমাদের খুঁজে বের করা ওদের পক্ষে কঠিন হবে। শত শত গুহা পথ আছে পশ্চিমের পাহাড়গুলোর গায়ে, আমাদের ধরা খুবই কঠিন হবে। একবার দ্বারোকা পৌঁছতে পারলে আর চিন্তা নেই। ওখানে দু'দুটো গোপন আস্তানা আছে আমাদের।'

'আমরাও সেই প্ল্যানই ঠিক করে এসেছিলাম। ভয় ছিল গুহার গোলক ধাঁধায় না পড়ে যাই। তুমি সঙ্গে থাকলে নিশ্চিন্ত থাকা যাবে। ভোর চারটের সময় আমরা এখান থেকে রওনা হব।'

'কি চিন্তা করছেন?' অনেকক্ষণ রানাকে চুপচাপ থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল আরীফ।

'ভাবছি টিএনটি আর ডিটোনেটারের বাক্স দুটো কোথাও লুকিয়ে ফেলতে পারলে হত। কখন কি অবস্থায় আমাদের এই গুহা ছাড়তে হয় কিছুই বলা যায় না। একে মাহবুব, তার ওপর বাক্সগুলো, সব মিলে মস্ত বোঝা হয়ে যাবে জরুরী অবস্থায়।'

খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবল আরীফ, তারপর বলল, 'চিন্তা নেই। আমি এগুলো এমন একটা জায়গায় লুকিয়ে রাখব যেখান থেকে খুঁজে বের করা কারও পক্ষে সম্ভবপর হবে না কিছুতেই। দুটো বাক্স তো একা নিতে পারব না, আপনাদের একজনকে আসতে হবে আমার সঙ্গে। আধঘণ্টার ব্যাপার।'

'আমি যাচ্ছি,' উঠে দাঁড়াল আলতাফ। বড় বাক্সটা অনায়াসে তুলে নিল কাঁধের ওপর। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল আরীফের পেছন পেছন।

মিশ্রী খান আর নাজির বেগ ফিরে এল আধঘণ্টার মধ্যেই। প্রায় সাথে সাথেই ফিরল আলতাফ আর আরীফ। কথার খৈ ফুটল মিশ্রী খানের মুখে।

নাজির বেগের আশ্চর্য কৌশলে ওষুধপত্র, খাবার আর কাপড়-চোপড় জোগাড়ের কাহিনী। শেষে বলল, 'খোদ কর্নেলের কোয়ার্টার থেকে রুটি নিয়ে এসেছে সে।'

'কর্নেলের বাড়ি থেকে? অসম্ভব!' বলল রানা।

'নাজির বেগের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়, ওস্তাদ। কিছুই অসম্ভব নয়। আমাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে গেছে, দুই হাঁটু ঠকাঠক বাড়ি খাচ্ছে তখন আমার, চিন্তা করছি একটু আওয়াজ পেলেই ঝেড়ে দৌড় দেব- কিন্তু কোন্‌দিকে যাব স্থির করে উঠতে পারছি না…এমন সময় ঝুড়ি ভর্তি করে এইসব নিয়ে বেরিয়ে এল ভাতিজা নিরাপদে। এই লোকের সঙ্গে আর কোথাও পাঠালে আমি হার্টফেল করব, ওস্তাদ!'

'কিন্তু গার্ড, সেন্ট্রি, কেউ দেখল না?'

'সব ব্যাটারা বোধহয় বেরিয়ে পড়েছে আমাদের খুঁজতে। কর্নেলের সদর দরজায় দুটো টোকা দিয়েই ছুটে গিয়ে ঢুকেছে সে পেছনের রান্নাঘরে। পথে গ্রামের কয়েকজন লোককে ডেকে তুলে আড়ালে নিয়ে গিয়ে জেনেছে মিলিটারি সার্চের ব্যাপার। সব কিছুই ওর চেনা।'

আরীফ আর নাজির বেগ নিচু গলায় কি যেন আলাপ করছে। বেশির ভাগ কথা বলছে নাজির বেগ।

'কি ব্যাপার, আরীফ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ব্যাপার তেমন সুবিধের নয়, মেজর। খুব তাড়াতাড়ি আমাদের এই জায়গা ছেড়ে সরে যেতে হবে। নাজির তো এই মুহূর্তে রওনা হতে চায়। আশেপাশে সমস্ত গ্রাম আজ রাতের মধ্যে সার্চ করে ওরা ভোরে আবার আসবে পাহাড়ে। এখনই সরে না গেলে অসুবিধা হবে।'

'কিন্তু মাহবুব?'

'ওস্তাদ!' হঠাৎ চিৎকার করে উঠল মিশ্রী খান। 'মাহবুবের এই দশা হলো কি করে?'

স্পালিয়ে গিয়েছিল ও গুহা থেকে। আমাদের গলগ্রহ হয়ে থাকতে চায় না ও আর। লুকিয়ে ছিল দুটো মস্ত পাথরের ফাঁকের মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায়। আলতাফ খুঁজে বের করেছে।'

জিভ দিয়ে চুক্ চুক শব্দ করল মিশ্রী খান। তারপর বলল, 'আগামী দু'দিনের মধ্যে ওকে এখান থেকে এক পা-ও সরানো যাবে না। আজ রাতে তো অসম্ভব।'

ব্যাণ্ডেজ খুলতে আরম্ভ করল মিশ্রী খান। পকেট থেকে একটা ম্যাপ বের করল রানা। দুর্গের ম্যাপ। বলল, 'এদিকে আসুন, মি. নাজির বেগ। দুর্গটা সম্পর্কে আপনার সাথে কিছু আলাপ করতে চাই। শুনলাম দুই-দুইবার আপনি ঢুকে দেখে এসেছেন দুর্গের ভেতরটা। আমি নিজেও অনেক কিছু জানি, কিন্তু আপনার জ্ঞানও আমার খুব কাজে লাগবে। সব কিছু বলে যান,

কোথায় কি আছে কিচ্ছু বাদ দেবেন না। পাওয়ার রুম, গার্ড রুটিন, অ্যালার্ম সিসটেম, সব। যত সামান্য ব্যাপারই হোক বাদ দেবেন না, যেমন ধরুন দরজাগুলো ভেতর দিকে খোলে না বাইরের দিকে, কোন্খানে ছায়াটা বেশি ঘন, কোথায় আলো, কোথায় অন্ধকার, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপার জানতে চাই আমি।'

'কিন্তু ভেতরে ঢুকছেন কি করে আপনারা?' জিজ্ঞেস করল আরীফ।

'এখনও সেটা জানি না। দুর্গটা না দেখলে আগে থেকে কিছুই বলা যাচ্ছে না।' রানা অনুভব করল চট্ করে ওর দিকে একবার চেয়েই অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল আলতাফ। দুর্গে ঢোকার প্ল্যান ওরা নৌকাতেই ঠিক করে রেখেছে। কিন্তু যত কম লোকে প্ল্যানটা জানতে পারে ততই মঙ্গল। এরই ওপর নির্ভর করছে সবকিছু।

ঘণ্টা খানেক হুমড়ি খেয়ে পড়ে রইল ওরা চার্টের ওপর। প্রতিটা নতুন তথ্য নোট করে নিল রানা। অদ্ভুত তীক্ষ্ণ নাজির বেগের চোখ। মাত্র দুইবারের স্বল্পস্থায়ী অবস্থানেই সবকিছু দেখে এসেছে সে। চার্ট দেখেই ছবির মত সবকিছু ফুটে উঠল ওর মনের পর্দায়- গড় গড় করে বলে গেল যা যা দেখেছে সব। মিশ্রী খান আর আলতাফ ব্রোহী মাহবুবের পা-টা ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিল আবার। কাজ শেষ করেই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল মিশ্রী খান মাহবুবের পাশে।

'পিঠটা একটু সোজা করে নিই, ওস্তাদ, তারপর একটু কথা আছে।'

আলতাফ নিঃশব্দে রাইফেলটা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আধ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল সে।

'সবাই চুপ! কি যেন নড়াচড়া করছে বাইরে।'

কথাটা শেষ হবার আগেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বেরিয়ে গেল নাজির বেগ। এমনি সময় হঠাৎ কথা বলে উঠল মাহবুব।

প্রলাপ বকছে। ক্রমেই গলার স্বর উঠছে ওপরে।

মিশ্রী খান উঠে বসে মাহবুবের একটা হাত ধরল, আরেক হাত কপালে আর চুলের মধ্যে বুলাতে বুলাতে নিচু গলায় আবোল তাবোল কথা বলতে আরম্ভ করল। একঘেয়ে ভাবে কথা বলে যাচ্ছে মিশ্রী খান। প্রথমে কিছুই ফল হলো না- কিন্তু অল্পক্ষণেই হিপনোসিসের মত কাজ দিল মাথায় হাত বুলানো আর অনর্গল একঘেয়ে সুরে কথা বলা। থেমে গেল প্রলাপ ধীরে ধীরে। হঠাৎ চোখ খুলে চাইল সম্পূর্ণ সজাগ মাহবুব।

'কি ব্যাপার, ক্যাপ্টেন খান? আমার মাথায়...'

'শ্ শ্ শ্!' চুপ করতে ইশারা করল মিশ্রী খান।

বুঝতে পারল মাহবুব। গুহার চারদিকে চেয়ে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে। আবার চোখ বন্ধ করল সে।

'কিছু না,' পর্দা সরিয়েই বলল নাজির বেগ। 'কয়েকটা পাহাড়ী ছাগল।'

'ছাগল তো মনে হলো না আমার কাছে,' বলল আলতাফ। 'আমি আরেকবার দেখে আসি।'

মিশ্রী খানের ইশারায় রানাও বেরিয়ে এল গুহার বাইরে।

'একটু শুঁকে দেখেন, ওস্তাদ!'

রক্তমাখা একরাশ ব্যাণ্ডেজ তুলে ধরল মিশ্রী খান রানার নাকের সামনে। একটু শুঁকেই নাক কুঁচকে পেছনে সরে গেল রানা।

'কি হয়েছে, মিশ্রী?'

'গ্যাংগ্রিন!' বলল মিশ্রী খান হতাশ কণ্ঠে। 'গ্যাস গ্যাংগ্রিন। দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ছে। ছেলেটাকে বাঁচানো গেল না, ওস্তাদ।'

একটু পরেই ফিরে এল আলতাফ। ছাগলও দেখতে পায়নি সে এবার।

নয়

ঘুমন্ত অবস্থায় ধরা পড়ল ওরা ভারতীয় সৈন্যদের হাতে। ভোর তখন সাড়ে চারটা। কোনও সুযোগ পেল না ওরা বাধা দেবার। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় আত্মসমর্পণ করতে হলো ওদেরকে অতর্কিতে অনুপ্রবেশকারী সৈন্যদের কাছে।

রানাই প্রথম জাগল। রানার অচেতন মনের একটা অংশ সব সময় প্রস্তুত থাকে বিপদের জন্যে। এক মুহূর্তে পূর্ণ সজাগ রানা উঠে বসল গুহার মধ্যে কি একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনে। ডান হাতটা চলে গেল স্প্রিং লোডেড শোলডার হোলস্টারের কাছে। কিন্তু দপ্ করে জ্বলে উঠল একটা টর্চের তীব্র আলো। মূর্তির মত স্থির হয়ে গেল রানা। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না সে। টর্চের পেছন থেকে একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'কেউ নড়বে না। নড়লেই মারা পড়বে!'

এক, দুই করে আরও তিনটে টর্চ জ্বলে উঠল। সমস্ত গুহাটা আলোকিত হয়ে গেল উজ্জ্বল আলোয়। রানা চেয়ে দেখল কেবল টর্চ নয়; অটোমেটিক কারবাইনের চক্চকে নলও দেখা যাচ্ছে টর্চগুলোর পাশে।

'মাথার ওপর হাত তোলো সবাই!' আবার এল তীক্ষ্ণ আদেশ। ধীরে ধীরে মাথার ওপর হাত তুলল রানা। চেয়ে দেখল মাহবুব ছাড়া সবাই উঠে বসেছে এতক্ষণে। ওর দেখাদেখি সবাই হাত তুলল মাথার ওপর।

'দেখেছ, শান্তা, একবিন্দু ভাব পরিবর্তন নেই ওদের মুখে, চোখের পাতাও কাঁপল না একবার। ভয়ঙ্কর লোক এরা, শান্তা। পাকিস্তান তার সেরা লোকদেরই পাঠিয়েছে।'

তিক্ততায় ভরে গেল রানার মন। হেরে গেছে সে। এবার কপালে কি ঘটতে যাচ্ছে ভাবতে গিয়ে আঁৎকে উঠে দূর করে দিল সে চিন্তাটা মন

থেকে। ভবিষ্যৎ ভেবে লাভ কি? প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি কাজ, প্রতিটা চিন্তা এখন ব্যয় করা উচিত বর্তমানের পেছনে। ধরা পড়েছে বলে যে ধরা পড়েই থাকতে হবে তার কোনও মানে নেই। বিপদমুক্তির কোনও না কোনও পথ নিশ্চয়ই আছে। ভবিষ্যৎ ভাবতে গেলে হাত পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যেতে চায়, ভবিষ্যৎ কল্পনা সব সময় সুখকর নয়।

নাজির বেগের কি হলো? ভোর রাতের পাহারায় ও-ই ছিল। ওকি পায়ের শব্দ শুনে লুকিয়ে পড়েছে কোথাও, নাকি ধরা পড়েছে? জিজ্ঞেস করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রানা। যদি সে ধরা পড়ে না থাকে তাহলে এখনও সুযোগ আছে। একজন সেন্ট্রি দক্ষ হাতে হোলস্টার থেকে তুলে নিল রানার পিস্তলটা।

'আমাদের খুঁজে পেলে কি করে?' জিজ্ঞেস করল রানা শান্ত কণ্ঠে।

'কর্নেল রাম নারায়ণের কোয়ার্টার থেকে খাবার চুরি করে অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দিয়েছ বলে ভাবছ তোমরা। আসলে কাজটা গর্দভের কাজ হয়েছে। দুটো ব্লাড হাউণ্ড এখানে নিয়ে এসেছে আমাদের- নিজেদের আর বিশেষ কষ্ট করতে হয়নি।'

'কিন্তু এত বৃষ্টির মধ্যে…' মিশ্রী খান কিছু বলতে যাচ্ছিল।

'শাট আপ!' ধমক দিয়ে ওকে থামিয়ে দিয়ে পাশ ফিরল অফিসার। স্পর্দাটা ছিঁড়ে নামিয়ে দাও। আমার দুই ধারে দুইজন করে রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত থাকো।' আবার ফিরল সে রানাদের দিকে। 'তোমরা চারজন বেরিয়ে এসো বাইরে। বিশ্বাস করো, তোমাদের কুকুরের মত গুলি করে মারবার ছুতো খুঁজছে আমার লোকেরা। কারও কোনও মতলব থাকলে চেষ্টা করে দেখতে পারো- ফল ভাল হবে না।'

মাথার ওপর হাত তুলে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল চারজন। এক পা এগোতেই আবার আদেশ এল চাবুকের মত। থমকে থেমে গেল সবাই।

'দাঁড়াও!' টর্চের আলো ফেলল সে এবার মাহবুবের ওপর। আলতাফের উদ্দেশে বলল, 'একপাশে সরে দাঁড়াও। কে লোকটা?'

'ওকে ভয় পাবার কিছুই নেই,' বলল রানা। 'আমাদেরই লোক, কিন্তু ভয়ঙ্কর ভাবে জখম হয়েছে। ও এখন মৃত্যু শয্যায়।'

'আচ্ছা, দেখছি। পেছনে সরে যাও সবাই। একেবারে ওই দেয়াল পর্যন্ত।' মাহবুবকে ডিঙিয়ে সরে গেল ওরা দেয়ালের দিকে। চট্ করে বসে পড়ে মাটির ওপর কারবাইনটা রেখে পিস্তল বের করল অফিসার। ধীরে ধীরে এগোল মাহবুবের দিকে। রানা চেয়ে দেখল, চারটে রাইফেল প্রস্তুত আছে ওদের জন্যে। অফিসারের সাথে সাথে ওরাও এগিয়ে আসছে সামনে। রানা বুঝল, চমৎকার ট্রেনিং পেয়েছে এরা, রীতিমত দক্ষতা প্রকাশ পাচ্ছে এদের প্রতিটা কার্যকলাপে।

এক ঝটকায় মাহবুবের গায়ের চাদরটা উঠিয়ে ফেলল অফিসার। ঘুমের

মধ্যেও ককিয়ে উঠল মাহবুব আহত পায়ে হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে। দ্রুত একবার চোখ বুলাল অফিসার মাহবুবের কুঁচকানো মুখ আর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পায়ের ওপর। গ্যাংগ্রিনের দুর্গন্ধ নাকে পৌঁছতেই খানিকটা পিছিয়ে গেল সে। তারপর যত্নের সঙ্গে ঢেকে দিল আবার মাহবুবের অসুস্থ দেহ।

'সত্যি কথাই বলেছ। আমরা বর্বর নই। মুমূর্ষু লোকের সাথে আমাদের কোন ঝগড়া নেই। ও এখানেই থাক, বাকি সবাই বেরিয়ে এসো গুহা থেকে।'

উঠে দাঁড়িয়ে পায়ে পায়ে পিছিয়ে গেল অফিসার স্থির নিষ্কম্প হাতে টর্চ আর পিস্তল ধরে। পিস্তলটা হোলস্টারে রেখে কারবাইন তুলে নিল সে মাটি থেকে।

ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল সবাই বাইরে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। এখনও অন্ধকার চারদিকে- কিন্তু পুবের আকাশটায় ফর্সা হয়ে আসবার আভাস। উজ্জ্বল একটা ভোরের তারা টিপটিপ করে জ্বলছে। পবিত্র, শান্ত একটা ভাব।

চারদিকে চাইল রানা নিরুৎসুক দৃষ্টি মেলে। স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছে সে। নাজির বেগের কোন চিহ্নই নেই। লাফিয়ে উঠল রানার বুকের ভেতরটা আশার আলো দেখতে পেয়ে। দ্রুত চলতে আরম্ভ করল চিন্তা। নাজিরের হাতে অটোমেটিক রাইফেল আছে একটা, এরা মোট আটজন। এক্সট্রা ম্যাগাজিন কি নিয়েছিল সে সাথে? যদি লুকিয়ে গুলি ছুঁড়তে পারে তাহলে এই আটজনকে শেষ করে দিতে পারবে নাজির স্পেয়ার ম্যাগাজিন না থাকলেও।

'তুমি হয়তো ভাবছ তোমাদের প্রহরীটা কোথায় গেল, তাই না?' বিদ্রূপ ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করল অফিসার। জামার হাতায় চিহ্ন দেখে এতক্ষণে বুঝল রানা ওর র‍্যাঙ্ক হচ্ছে লেফটেন্যান্ট। 'অত ভাবনার কিছু নেই। বেশি দূর নয়, কাছেই ঘুমিয়ে আছে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সে এখন।'

'তোমরা খুন করেছ ওকে?' দুই হাত মুঠো করে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল রানা। হাতের তালু ব্যথা হয়ে গেল আঙুলের চাপে।

'মরে গেছে না বেঁচে আছে সঠিক করে বলতে পারব না। অতি সহজে আমাদের ফাঁদে পা দিয়েছে লোকটা। ওই পাথরের আড়ালে আমাদের একজন বসে মুখ দিয়ে একটা বিচিত্র শব্দ করেছে- ও গেছে শব্দের উৎস অনুসন্ধান করতে। দ্বিতীয়জনের রাইফেলের কুঁদো পড়েছে এসে মাথার ওপর। ব্যস, ফ্ল্যাট।'

ধীরে ধীরে মুঠি দুটো ঢিল করল রানা। তাহলে নাজির বেগের আশাও শেষ।

'যাক্। কোথায় চলেছি আমরা এখন?'

'রাজগড়ে। কিন্তু একটা কথার আগে উত্তর দাও। এক্সপ্লোসিভগুলো

কোথায়?’

সোজা টর্চটা ধরল লেফটেন্যান্ট রানার মুখের ওপর।

‘এক্সপ্লোসিভ!’ বিস্মিত হবার ভান করল রানা। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, ‘কিসের এক্সপ্লোসিভ?’ কথাটা শেষ করবার আগেই দড়াম করে সাত ব্যাটারির টর্চটা এসে লাগল ওর মুখে প্রচণ্ড বেগে। পড়ে গেল রানা মাটিতে। টলতে টলতে আবার উঠে দাঁড়াল সে। ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে। জিভে নোনতা লাগল রক্তের স্বাদ।

‘কোথায় টিএনটি-র বাক্স?’

‘গাঁজা খেয়েছ নাকি হে, ছোকরা! কি আবোল তাবোল…’

‘শাট্ আপ্!’

আবার চালাল সে টর্চ। মুখটা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু চোয়ালের হাড়ের ওপর এসে পড়ল সেটা ঠকাশ্ করে। ঠিক জুলফির নিচে। আঁধার হয়ে গেল রানার চোখ - টলমল করে দুলছে দুনিয়াটা। দরদর করে রক্ত পড়ছে গাল বেয়ে। মূর্ছার শেষ প্রান্ত থেকে নিজেকে ফিরিয়ে আনল সে অমানুষিক মানসিক বল প্রয়োগ করে। আবার পায়ের নিচের মাটিটা শক্ত মনে হলো ওর কাছে।

‘বন্দীদের প্রতি এই কি ভারতীয় ব্যবহার নাকি?’ বলল সে নিস্তেজ কণ্ঠে।

‘বন্দী যদি সৈনিক হত তাহলে সে অন্য ব্যবহার পেত। কিন্তু নরঘাতক স্পাইয়ের জন্যে…’ উত্তেজনায় কাঁপছে লেফটেন্যান্টের কণ্ঠস্বর।

‘আমরা স্পাই না,’ হাতের পোঁছায় ঠোঁটের রক্ত মুছে বলল রানা। ‘আমরা সৈনিক, যুদ্ধ করতে এসেছি শত্রুদেশের সঙ্গে।’

‘তাহলে তোমাদের ইউনিফরম কোথায়? তোমরা নিশাচর স্পাই! রাতের অন্ধকারে মানুষের পিঠে ছুরি বসিয়ে দাও। তোমরা কসাই। সুযোগ পেলেই গলায় ছুরি চালাও।’ হঠাৎ থেমে গেল লেফটেন্যান্ট কিছু একটা জিনিসের ওপর চোখ পড়তেই। রানা ঘুরে দেখল নাজির বেগকে নিয়ে আসা হচ্ছে এদিকে। পেছন থেকে বেয়োনেটের খোঁচায় কাতরাতে কাতরাতে আসছে সে। কাছে আসতেই দেখা গেল বাম গালটায় এক থোকা রক্ত জমে আছে। মাথার কোনও একটা গুরুতর জখম থেকে রক্ত পড়েছে প্রচুর পরিমাণে।

‘সবাই বসে পড়ো মাটিতে,’ আদেশ দিল লেফটেন্যান্ট। নিজের লোকদের দিকে ফিরে বলল, ‘হাতগুলো বেঁধে ফেলো।’

‘আমাদের গুলি করে মেরে ফেলা হবে এখন, তাই না?’ শান্ত ভাবে জিজ্ঞেস করল রানা। তাই যদি হয় তাহলে যুদ্ধ করে মরবে, স্থির করল সে। হাতবাঁধা অবস্থায় মরার চেয়ে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দেয়া অনেক ভাল। কিন্তু যদি এই মুহূর্তে ওদেরকে হত্যা করবার ইচ্ছে লেফটেন্যান্টের না থাকে, তাহলে

সুযোগের অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

‘আমি দুঃখিত। সেটা করতে পারলেই খুশি হতাম। কিন্তু আমাদের কর্নেল রাম নারায়ণজী আগে তোমাদের সাথে দু’চারটে কথা বলতে চান। তোমাদের পক্ষে অবশ্য ওঁর সাথে দেখা হওয়ার চাইতে এক্ষুণি গুলি খেয়ে মরে যাওয়া শতগুণে ভাল হত।’ লেফটেন্যান্ট হাসল একটু। ‘তারপর তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে দ্বারোকার অফিসার ইন কম্যাণ্ড বিগ্রেডিয়ার চৌধুরীর কাছে। আজ সূর্যাস্তের আগেই সব খতম হয়ে যাবে। স্পাইদের ব্যাপারে খুব তাড়াতাড়িই কাজ সেরে থাকি আমরা।’

‘কিন্তু, স্যার! ক্যাপ্টেন!’ দুই হাত তুলে যেন নালিশ জানাচ্ছে এইভাবে এক পা এগিয়ে এল আলতাফ। তারপর থমকে দাঁড়াল দুটো রাইফেলের মাথা বুকের ওপর ঠেকতেই।

‘ক্যাপ্টেন না, আমি লেফটেন্যান্ট।’ শুদ্ধ করে দিল অফিসার। ‘আমি লেফটেন্যান্ট অলোক রায়। কি বলছ তুমি, মোটা গর্দভ?’

‘আপনি স্পাইয়ের কথা বলছেন। আমি স্পাই না, হুজুর!’ তড়বড় করে বলতে গিয়ে বেধে যাচ্ছে মুখের কথা। ‘কিরে কেটে বলছি, হুজুর, আমি স্পাই না। আমি ওদের লোক না!’ দুই চোখ বিস্ফারিত। কথার শেষে নিঃশব্দে ঠোঁট দুটো নড়ছে। ‘আমি কচ্ছের জেলে একজন। গরীব জেলে। এরা জোর করে ধরে এনেছে আমাকে কচ্ছ ভাষা হিন্দিতে অনুবাদ করবার জন্যে। গায়ের জোরে ধরে এনেছে। কিরে কেটে বলছি, হুজুর!’

‘ওরে শালা হারামজাদা!’ ঘুসি পাকিয়ে এগোচ্ছিল মিশ্রী খান, কিন্তু ‘উহ্’ বলেই বাঁকা হয়ে গেল ওর দেহটা পেছন দিকে। ভয়ঙ্কর জোরে শিরদাঁড়ার ওপর এসে পড়েছে একটা রাইফেলের বাঁট। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে মাটিতে। মাটিতে পড়েও চিৎকার করে চলল মিশ্রী খান। ‘নিমকহারাম, দুইমুখো সাপ। ওরে শুয়োরের বাচ্চা, তোকে দেখে নেব আমি…’ ঠাস করে একটা শব্দ হলো। একটা বুটের লাথি এসে পড়ল মিশ্রীর মাথায়। ঢলে পড়ল সে জ্ঞান হারিয়ে।

পাথরের মত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল রানা। মিশ্রীর দিকে ফিরে চাইল না একবারও। হাত দুটো মুঠো করে দাঁতে দাঁত চেপে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে আলতাফের দিকে। আলতাফের মাথায় কি প্ল্যান এসেছে জানে না সে, অনুমানও করতে পারল না; কিন্তু এটুকু বুঝল, ওর এই বানানো গল্পটাকেই সত্য বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে হবে।

‘অর্থাৎ?’ প্রশ্ন করল লেফটেন্যান্ট অলোক রায়, তারপর নিজেই উত্তর দিল। ‘গোদের ওপর বিষফোঁড়া। যাই হোক মটু সিং, তোমার কপাল মন্দ। জুয়ার আWডায় যাদের ধরা হবে- সব জুয়াড়ী; দর্শক বললে মাপ নেই। তোমার ভাগ্য এই খুনীগুলোর সাথে লেখা হয়ে গেছে।’

‘না, না, না, হুজুর!’ ভয়ে উত্তেজনায় গলার স্বর উঁচু পর্দায় উঠে গেছে

আলতাফের। 'আমি সত্যি কথা বলছি, হুজুর। আমি ওদের দলের লোক না। ভগবানের দোহাই দিয়ে বলছি...' গলাটা ভেঙে গেল আলতাফের। একটু সামলে নিয়ে বলল, 'আমার কোনও দোষ নেই, হুজুর, আমাকে কেন ওদের সাথে মারবেন? আমি আসতে চাইনি ওদের সাথে। আমি লড়াইয়ের লোক না, হুজুর, আমি একজন গরীব জেলে।'

'সে-তো দেখতেই পাচ্ছি,' বলল লেফটেন্যান্ট অলোক রায়। 'আর্মিতে থাকলে এত চর্বি জমত না ওই বেধড়ক শরীরে। প্রতি আউন্স চর্বি তোমার কাছে মহামূল্যবান। তোমাকে সাথে আনা ওদের ঠিক হয়নি।'

'আমি সব কথা বলতে পারি, হুজুর। ওদের অনেক কথা জানি আমি। সব কথা শুনলে হয়তো আমাকে...'

'তবে রে, শয়তান?' বলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল রানা আলতাফের ওপর, দু'জন সেন্ট্রি ধরে ফেলল ওর দুই হাত, মুচড়ে টেনে রাখল পেছন থেকে। ঝাড়া দিয়ে ছুটবার ব্যর্থ চেষ্টা করল রানা, তারপর বলল, 'যদি মুখ দিয়ে একটা কথাও বের করিস, কসম খোদার, তোকে...'

'থামো!' ধমকে উঠল তরুণ লেফটেন্যান্ট। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'হয়েছে। আর একটি কথা উচ্চারণ করলে ওইখানে ওর পাশে শুয়ে থাকতে হবে।' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বুড়ো আঙুল দিয়ে মিশ্রী খানের জ্ঞানহীন দেহটা দেখাল অলোক রায়। তারপর আলতাফের দিকে ফিরে বলল, 'কোনও কথা দিতে পারছি না, কিন্তু তোমার কিছু বলার থাকলে শুনতে পারি।'

'সেটা আপনার দয়া। আমার কথা শুনলেই বুঝতে পারবেন, হুজুর।' আলতাফের কণ্ঠে আশা এবং Cকান্তিকতার আভাস ফুটে উঠল। সাহসও ফিরে এল কিছুটা। নাটকীয় ভাবে রানা আর মিশ্রীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল আলতাফ, 'এরা সাধারণ সৈনিক না, হুজুর- উঁচু উঁচু র‍্যাঙ্কের অফিসার। পাকিস্তান নেভির অফিসার সব।'

'যেটা আমরা জানি না সে-রকম কিছু তথ্য বলো, গর্দভ। এরা বহুদিন থেকেই পেছনে লেগেছে আমাদের। যদি তোমার এইটুকুই বলার থাকে...'

'দাঁড়ান!' হাত তুলে বাধা দিল আলতাফ। 'নানান জায়গা থেকে বেছে বেছে এদের একসাথে করা হয়েছে। গত রোববার বিকেল বেলা এসে পৌঁছেচে ওরা কেটি বন্দরে। সেইদিনই সন্ধ্যার সময় রওনা হয়েছে একটা নৌকায় চড়ে।'

মাথা নাড়ল অলোক রায়। 'এই পর্যন্ত আমরাও জানি। বলে যাও।'

'আপনারাও জানেন? কি করে...' বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাইল আলতাফ লেফটেন্যান্টের মুখের দিকে।

'সেটা তোমার না জানলেও চলবে। বলে যাও।'

'হঠাৎ ওদের এঞ্জিন খারাপ হয়ে যাওয়ায় পাল তুলে দিয়ে চলছিল ওরা, এমন সময় একটা পাহারাদার লঞ্চ আমার মাছ ধরার নৌকার পাশ দিয়ে

গিয়ে ওদের নৌকার সাথে লাগল। সেটাকে ডুবিয়ে দিয়েছে ওরা।'

'এত বড় লঞ্চটাকে ডুবাল কি করে?' ওটাকে যে ডুবানো হয়েছে তাতে অলোক রায়ের সন্দেহ নেই। কি করে ডুবানো হলো তাই জানতে চাইছে। অর্থাৎ ঠিকই সন্দেহ করেছিল রানা, খানসামা করিম আগেই খবর দিয়ে দিয়েছে এদেরকে। এরা প্রস্তুত হয়েই ছিল রানাদের জন্যে।

'ওরা আমার মত নিরীহ জেলের ভান করেছিল। লঞ্চটা নৌকার গায়ে গিয়ে লাগতেই গোলাগুলি ছুটতে আরম্ভ করল দুই পক্ষ থেকে। হঠাৎ দেখলাম দুইটা বাক্স উড়ে গিয়ে পড়ল লঞ্চের এঞ্জিন ঘরের মধ্যে। ব্যস, ভিড়িম! সব খতম!' দুই হাত ছুঁড়ে অভিনয় করে দেখাল আলতাফ।

'তাই ভাবছিলাম...যাক, তারপর?'

'কি ভাবছিলেন, হুজুর?' জিজ্ঞেস করেই লেফটেন্যান্টের কুঁচকানো ভুরু দেখে ভয় পেয়ে গেল আলতাফ। গড় গড় করে বলে চলল, 'ওদের মধ্যে কচ্ছ ভাষা জানত যে লোকটা সে এই যুদ্ধে মারা গিয়েছিল, তাই আমাকে জোর করে নৌকায় উঠিয়ে নিয়েছে। আমার তিন ছেলেকে হুকুম দিয়েছে সোজা গ্রামে ফিরে যেতে, গিয়ে চুপচাপ থাকতে। যদি একটি কথাও প্রকাশ পায় তাহলে আমাকে খুন করে ফেলবে বলে শাসিয়েছে। কানতে কানতে চলে গেছে আমার বাচ্চা তিনটে। খানিক বাদেই ঝড় উঠল, আহারে...আমার ছেলে তিনটে নিরাপদে পৌঁছতে পারল কিনা...'

'তোমার ছেলের গল্প কে শুনতে চেয়েছে, মোটা গর্দভ?' ধমকে উঠল অলোক রায়।

হকচকিয়ে গিয়ে আবার আরম্ভ করল আলতাফ, 'এই ঝড়ের মধ্যে একটা দ্বীপে নোঙর ফেলে অপেক্ষা করলাম আমরা। তারপর বললে বিশ্বাস করবেন না, হঠাৎ কোত্থেকে যেন একদল সৈন্য এসে উপস্থিত হলো সেই নির্জন দ্বীপে...আর তাই দেখেই আবার ছেড়ে দেয়া হলো নৌকা।'

'ঠিক উল্টো। তোমার এই কথাটা আমি বিশ্বাস করছি।' মাথা নাড়ল লেফটেন্যান্ট, যেন এই কথাগুলো নিজের কোনও গোপন জ্ঞানের সাথে মিলিয়ে দেখে মিল পাচ্ছে সে।

'তারপর তুফানের মধ্যেই নৌকা ভিড়িয়ে ডাঙায় উঠেছি।'

'নৌকাটার কি হলো?'

'এমনিতেই ডুবে যাচ্ছিল জল খেয়ে, ঘাটে পৌঁছবার পরই ডুবে গেছে।'

'তারপর?'

'তারপর পাড়ের গায়ের শিকড় বেয়ে উঠে এসেছি আমরা ওপরে। ওপরে একজন গার্ড ছিল- ওই লোকটা ছুরি চালিয়ে খুন করেছে তাকে।' রানার দিকে আঙুল দেখিয়ে নির্লজ্জের মত বলল আলতাফ। 'সারা রাত হাঁটিয়ে মেরেছে আমাকে ব্যাটারা। ওই জখম হওয়া লোকটাকে আমার কাঁধে চাপিয়ে আমাকে দিয়ে মোট বইয়েছে। গতকাল ভোর রাতে পৌঁছেছি আমরা

এই গুহায় ক্ষুধা তৃষ্ণায় আধমরা অবস্থায়। সেই থেকে এখানেই আছি।'

'তাহলে ওরা মোট ছয়জন এসেছে কেটি বন্দর থেকে?'

'না, হুজুর। চারজন। একজন মারা গেছে লঞ্চ ডুবির সময়। ওই দু'জন জুটেছে কাল রাত থেকে।'

মৃদু হাসল অলোক রায়। রানা বুঝল, এ কথাটাও মিলে যাচ্ছে ওর জানা তথ্যের সঙ্গে।

'ওদের কোনও কথাবার্তা শুনতে পাওনি তুমি?'

স্পাব না কেন? সারাক্ষণই তো শুনছি। ওরা এসেছে দ্বারোকার কামান আর রাডার ধ্বংস করতে।'

'হাওয়া খেতে যে আসেনি তা আমাদেরও জানা আছে,' বলল লেফটেন্যান্ট।

'দুর্গের প্ল্যান আছে ওই লোকটার পকেটে। এরা করাচির সাথে রেডিও দিয়ে কথাবার্তা বলছে চারঘণ্টা অন্তর অন্তর। পাকিস্তান নৌবাহিনী রওনা হয়ে গেছে দ্বারোকা বন্দর ধ্বংস করে দেবার জন্যে। এরা কামানগুলো ধ্বংস করতে পারলেই এগিয়ে এসে চুরমার করে দেবে সবকিছু। কী জানি না আমি…সব জানি।'

'হয়েছে, হয়েছে। মস্ত খবর দিয়েছ তুমি, মটু সিং। এক্ষুণি জানাতে হবে সব কথা কর্নেলকে। চমৎকার!' উজ্জ্বল হয়ে উঠল লেফটেন্যান্টের মুখ। উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে ওর শরীরের রক্ত। 'তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের। কিন্তু একটা কথা, টিএনটি কোথায় রেখেছে?'

আলতাফ দুই হাতের তালু চিৎ করল। 'হুজুর, সেটা আমি জানি না। গুহাতে রাখা নিরাপদ না ভেবে ওরা দু'জন বাক্স দুটো নিয়ে গিয়ে কোথায় যেন লুকিয়ে রেখেছে।' রানা আর মিশ্রী খানের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল আলতাফ। 'ওই দিকে নিয়ে গেছে খুব সম্ভব।' সম্পূর্ণ উল্টো দিকে আঙুল নির্দেশ করল আলতাফ। আরীফের দুই চোখে নগ্ন বিস্ময় ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। 'আমাকে দেখতে দেয়নি। কাউকে বিশ্বাস করে না ব্যাটারা!'

'সেটা ওদের দোষের কিছু নয়। তোমাকে বিশ্বাস করলে ওদের কি অবস্থা হত বোঝাই যাচ্ছে। যাক্। ব্রিগেডিয়ার খুব সম্ভব তোমাকে মাফ করে দেবেন। ইনফরমারকে আমরা ভালমত পুরস্কৃত করি। কাজেই আরও লোকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার সুযোগ দেয়া হবে তোমাকে খুব সম্ভব।'

'হুজুর মা-বাপ। আমি জানতাম, হুজুর…'

'চোপ রাও!' ধমকে উঠল তরুণ লেফটেন্যান্ট। 'এখন নামগুলো বলো সবার এক এক করে।'

'ওর নাম নাজির বেগ, ও আরীফ, আর গুহার মধ্যে পড়ে আছে যে সে হচ্ছে লেফটেন্যান্ট মাহবুব, এই মোচওয়ালা লোকটার নাম ক্যাপ্টেন মিশ্রী

খান আর এদের লীডার হচ্ছে ওই গুণ্ডার মত লোকটা- মেজর মাসুদ রানা।'

'মেজর…কি বললে?' হঠাৎ পাঁই করে ঘুরে টর্চের আলো ফেলল লেফটেন্যান্ট রানার মুখের ওপর। 'কি বললে? মাসুদ রানা? মাসুদ রানা!' দুইবার দু'ভাবে উচ্চারণ করল সে নামটা। এগিয়ে এল কয়েক পা। ভাল করে পরীক্ষা করল রানার মুখ। আপন মনে বলল, 'মাসুদ রানা! পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মাসুদ রানা!'

এতক্ষণ হিন্দীতে কথা হচ্ছিল, হঠাৎ পরিষ্কার বাংলায় কথা বলে উঠল লেফটেন্যান্ট। চাপা উত্তেজনা ওর কণ্ঠস্বরে।

'আমার বোনের মৃত্যু কিভাবে হয়েছিল, মাসুদ রানা?'

'তোমার বোন!' অবাক হলো রানা।

'হ্যাঁ। আমার বোন, সুলতা রায়। কিভাবে মারা গেছিল সে?'

রানা লক্ষ করল থর থর করে কাঁপছে অলোক রায়ের টর্চ ধরা হাতটা। গলাটাও কেঁপে গেল শেষের দিকে। সুলতা। সেই সুলতা রায়ের ভাই এই অলোক রায়?

'কবীর চৌধুরী বলে এক বৈজ্ঞানিকের গুলিতে,' বলল রানা।

'কাপ্তাই রিজারভয়েরে ওর আস্তানা থেকে পালাবার সময়?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ওই বইটায় ঠিকই লিখেছিল?'

'কোন বইটা?'

'ওই যে আপনার এক বন্ধু কি যেন এক ছদ্মনামে কতগুলো বই লিখেছে। একটা বই কলকাতায় থাকতে হাতে এসেছিল- এক বর্ণও বিশ্বাস করিনি। কি যেন নাম- ও, ধ্বংস-পাহাড়। ওই বইয়ের সব কথা তাহলে সত্যি?'

'তা কি করে বলব? আমি পড়ি না ওসব বই।'

'সুলতা তাহলে সত্যিই মারা গেছে, বন্দী হয়ে নেই পাকিস্তানে?' হঠাৎ রানার কাঁধের ওপর হাত রাখল অলোক রায়। করুণ আকুতি ওর কণ্ঠে। 'দয়া করে মিথ্যে কথা বলবেন না, মেজর। আপনার মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না, আমিও না। কিন্তু ইচ্ছে করলে আপনি আমাকে জ্যান্ত মরা থেকে বাঁচাতে পারেন।'

রানা অনুভব করল একটি ভাইয়ের হৃদয়ে একমাত্র বোনের জন্যে সার্বক্ষণিক দুশ্চিন্তার যন্ত্রণা। কেন যেন মায়া হলো ওর ছেলেটির ওপর। সমস্ত ঘটনা গুছিয়ে বলল সে অল্প কথায়। মন দিয়ে শুনল অলোক রায়। প্রতিটি কথা বিশ্বাস করল।

'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ,' সব শুনে ঘুরে দাঁড়াল অলোক রায়। 'অনেক উপকার করলেন আপনি আমার। কিন্তু এই পরিবেশে আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি সত্যিই দুঃখিত, মেজর রানা। অন্য কোনও অবস্থায় হলে

হয়তো প্রতিদানে আপনার কোনও উপকার করতে পারতাম, কিন্তু এখন সেটা সম্ভব নয়।'

প্রত্যেকের হাত-পা বেঁধে ফেলা হলো।

'ওই মোটাকেও বাঁধো। পরে খুলে দেয়া যাবে। ওকে দিয়ে অসুস্থ লোকটাকে বইয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে পোস্টে। সার্জেন্ট শান্তা, গার্ড থাকো। বাকি সবাই চলো আমার সাথে। এক্সপ্লোসিভের বাক্সগুলো খুঁজে বের করতেই হবে আমাদের।'

'ওদের দিয়ে কথা বলাবার চেষ্টা করলে হয় না, স্যার?' সার্জেন্ট শান্তা জিজ্ঞেস করল। নির্যাতনের ছুতো খুঁজছে সে।

'যে লোকটাকে দিয়ে বলানো সম্ভব ছিল সে যা জানে সব বলে ফেলেছে। আর অন্যদের ব্যাপারে আমি মস্ত ভুল করতে যাচ্ছিলাম। এদের মুখ থেকে একটি শব্দও বের করা যাবে না। এরা ভেঙে যাবে, তবু বাঁকবে না। শুধু লক্ষ রাখবে এরা যেন পরস্পর কথা না বলে।'

অ্যাবাউট টার্ন করে চলে গেল লেফটেন্যান্ট। ওর পেছনে গেল সাতজন সেন্ট্রি। তিন মিনিট পর সার্জেন্ট শান্তা ছাড়া ভারতীয় সৈনিকের চিহ্নও রইল না আর।

কয়েকবার চেষ্টা করল রানা। নাহ্। ভেজা দড়ি আরও শক্তভাবে বসে যাচ্ছে কব্জিতে। যে লোকটা বেঁধেছে সে সত্যিই বাঁধতে জানে। বাঁধন খুলবার কোনও উপায় নেই। আধঘণ্টা ধরে বসে বসে পিঠটা ব্যথা হয়ে গেল রানার। শুয়ে পড়ল মিশ্রী খানের পাশে।

আলতাফ একবারই চেষ্টা করেছিল দড়ি ছিঁড়বার। মাংসের ভেতর ঢুকে গেছে দড়িটা। সেই থেকে সেন্ট্রির কাছে বসে বার বার ঘুরেফিরে অনুযোগ করছে সে যে বেশি শক্ত করে বাঁধা হয়েছে ওর হাত। কেটে বসে যাচ্ছে বাঁধনটা। কারণ, একটু লক্ষ করলেই পরিষ্কার বুঝে ফেলবে অলোক রায় কী অসাধারণ শক্তি আছে ওর গায়ে। নিজের যে চরিত্র সৃষ্টি করেছে সে, তার সাথে খাপ খাবে না এই দানবিক শক্তি।

রানা ভাবছে, আলতাফ আজ মূডে আছে। স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় করে চলেছে সে। অনেক সত্যি কথা বলে ফেলেছে সে লেফটেন্যান্টের কাছে, কিন্তু এমন কিছুই বলেনি যা ওরা জানতে পারত না। পাকিস্তান নেভির আগমনের সংবাদ ওরা এখনও যদি না জেনে থাকে তাহলে আগামী দু'ঘণ্টার মধ্যেই জানতে পারবে। মিশ্রী খান, নাজির বেগ আর আরীফ বসে আছে পাথরে হেলান দিয়ে।

ব্যথায় টনটন করছে রানার চোয়াল। নাজির বেগের কেমন লাগছে ভাবার চেষ্টা করল সে। আর মাহবুবের? সেন্ট্রিকে ছাড়িয়ে দৃষ্টিটা চলে গেল রানার গুহা-মুখের দিকে। হঠাৎ চমকে উঠল রানা। হিম হয়ে গেল ওর

বুকের ভেতরটা।

ধীরে চোখটা সরিয়ে আনল সে গুহা-মুখ থেকে, নিরাসক্ত ভাবে সেন্ট্রির ওপর নিবদ্ধ হলো ওর দৃষ্টি। একটা পাথরের ওপর বসে সতর্ক নজর রেখেছে শান্তা সবার ওপর। অটোমেটিক কারবাইনটা দুই হাঁটুর ওপর রাখা। ডান হাতের তর্জনী ট্রিগারের ওপর। গুহার দিকে পেছন ফিরে বসে আছে সে। রানা মনে মনে খোদার কাছে প্রার্থনা করল যেন লোকটা ঘুরে না তাকায়। যেন আর কিছুক্ষণ যেমন বসে আছে তেমনি বসে থাকে পেছন ফিরে। আর অল্প কিছুক্ষণ- খোদা! আবার দৃষ্টিটা চট করে ঘুরে এল গুহা-মুখ থেকে।

গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে মাহবুব। বুক আর পেটের ওপর ভর দিয়ে এগোচ্ছে সে অল্প একটু, তারপর ভাঙা পা-টা টেনে আনছে। দুই হাতে ভর দিয়ে দেহের উপরের অংশটা উঁচু করছে সে, এগিয়ে আসছে ইঞ্চি ছ'য়েক, তারপর উপরের অংশটাকে মাটিতে নামিয়ে নিচের অংশটা টেনে আনছে। ব্যথায় আর অবসাদে ঝুলে পড়েছে মাথাটা। কুঁচকে যাচ্ছে গাল দুটো। সমস্ত মানসিক শক্তি একত্রিত করে আবার এগোচ্ছে। ওর ব্যথার কথা ভেবে দাঁতে দাঁত চেপে রানার নিজের মুখটাই বিকৃত হয়ে যাচ্ছিল- সতর্ক হয়ে নিজেকে স্বাভাবিক রাখল সে। এত জ্বর গায়েও মাথা ঠিক রেখেছে মাহবুব; একটা খয়েরী রঙের চাদর জড়িয়ে নিয়েছে দেহের ওপর, যাতে কিছুটা ক্যামোফ্লেজের কাজ হয়। ডান হাতে একটা ছুরি ধরা। নিশ্চয়ই সে অলোক রায়ের শেষের কথাগুলো শুনতে পেয়েছে। বুঝতে পেরেছে পিস্তল ছুঁড়লে লাভ নেই- ছুটে চলে আসবে লেফটেন্যান্ট দলবল সহ। তার আগে কারও হাত-পায়ের বাঁধন খুলতে পারবে না সে এতদূর এসে।

আর পাঁচ গজ, খোদা আর পাঁচটা গজ। সামান্য বাতাসের শব্দ ছাড়া কোথাও কোনও শব্দ নেই। মাহবুবের এগোনোর শব্দ কানে যাবে সেন্ট্রির আর একটু এগোলেই।

মাথা নিচু করে কাশতে আরম্ভ করল রানা। প্রথমে একটু অবাক হয়ে চাইল সার্জেন্ট রানার দিকে, ক্রমাগত কেশেই যাচ্ছে দেখে বিরক্ত হয়ে উঠল সে।

'অ্যাই, মেজর কা বাচ্চা। কাশি থামা!' খ্যাক-খ্যাক করে ধমকে উঠল সার্জেন্ট শান্তা।

'থামতে পারছি না!' কেশে উঠল রানা আবার। 'আমার কি দোষ? খক্ খক্। তোমাদের লেফটেন্যান্টের খক্কর খক্ দোষ। গলার ভেতর রক্ত ঢুকে, খক্ খক্ খক্ হ্যাঁচ্চো, সড়কে গেছে।'

আর পাঁচ ফুট। কিন্তু শক্তি ফুরিয়ে গেছে মাহবুবের। এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি করে এগোচ্ছে সে এখন। বোধহয় জ্ঞান হারিয়েছে। আধ মিনিট পড়ে থাকল সে মাটিতে মুখ গুঁজে। না। শক্তি সঞ্চয় করছিল সে। এবার আবার দুই হাতে ভর দিয়ে ছয় ইঞ্চি এগিয়ে এল মাহবুব। কিন্তু হঠাৎ একটা হাত

পিছলে গিয়ে ধড়াশ করে পড়ে গেল। কেশে উঠল রানা। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। একলাফে উঠে দাঁড়িয়েই পেছন ফিরল সার্জেন্ট। অটোমেটিক কারবাইনের মুখটা স্থির হলো মাহবুবের মাথার দিকে চেয়ে। মাহবুবকে চিনতে পেরে রাইফেলের মুখটা সরাল সে অন্য দিকে।

'এরই জন্যে এত কাশি আসছিল মেজর বাহাদুরের!'

রাইফেলের বাঁটটা সাঁ করে নেমে আসছিল মাহবুবের মাথার ওপর। কিন্তু শেষ মুহূর্তে থেমে গেল। বোধহয় দয়া হলো ওর। মাহবুবের দুর্বল হাত থেকে ছুরিটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল বহুদূরে। চাদরটা গায়ের ওপর থেকে তুলে নিয়ে দলা পাকিয়ে গোল করল, তারপর ওর অজ্ঞান মাথার নিচে গুঁজে দিল সেটা। মাথাটা নাড়ল এদিক-ওদিক বিষণ্নভাবে। আবার গিয়ে বসল উঁচু পাথরের ওপর।

ফর্সা হয়ে গেছে চারদিক। দূরে কয়েকজনের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

দশ

কর্নেল রাম নারায়ণ বেঁটে-খাটো ছিমছাম চেহারার লোক। বয়স পঁয়তাল্লিশ। চেহারায় একটা নিষ্ঠুর ভীতিকর ভাব জন্মগত ভাবেই আছে ওর মধ্যে। পরিষ্কার বোঝা যায় এই লোকটার সংস্পর্শই অশুভ। ছোট্ট লম্বাটে মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। ঠোঁটগুলো লালচে। হাসিটা চারকোনা- লেটার বক্সের ফোকরের মত। ভয়ঙ্কর। ডান গালে একটা লম্বা কাটা চিহ্ন। হাসুক বা গম্ভীর হয়ে থাকুক চোখের কোনও ভাব পরিবর্তন নেই। জুল-জুল করছে বিষণ্ন দৃষ্টি। মুখের মসৃণ চামড়া টান টান হয়ে আছে। রানা বুঝল এ লোক স্নায়বিক দুর্বলতায় ভুগছে। মানসিক ভারসাম্য নেই।

টেবিলের ওপাশে একটা চেয়ারে বসে ছিল রাম নারায়ণ। অলোক রায়ের রিপোর্ট শেষ হতেই হাসল সে রানার দিকে চেয়ে। চারকোনা একটা গর্ত সৃষ্টি হলো মুখে- ভেতরটা অন্ধকার। নিস্পৃহ চোখ জোড়া সারাটা ঘরে ঘুরে এল একবার। এক নজরেই সব কিছু দেখে নিল সে, কিছুই বাদ গেল না। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা গার্ড, হাত-বাঁধা বন্দীদের পেছনে আছে দু'জন গার্ড, মাহবুবকে বেঞ্চির ওপর শুইয়ে রেখে ঘর্মাক্ত আলতাফ রয়েছে বেঞ্চের এক ধারে। সব চোখে পড়ল কর্নেলের।

'চমৎকার, অলোক! যথেষ্ট তৎপরতার সাথে কাজ করেছ।' একটা ভুরু উঁচু করে বন্দীদের বিধ্বস্ত চেহারার দিকে চেয়ে বলল, 'সামান্য কিছু গোলমাল হয়েছিল মনে হচ্ছে। বন্দীরা প্রথমে বোধহয় ঠিক সহযোগিতা করতে চায়নি, তাই না?'

'ওরা কোনও বাধাই দেয়নি। কোনও সুযোগই পায়নি বাধা দেবার।' বলার ভঙ্গি দেখে বুঝল রানা, এই লোকটাকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে অলোক রায়।

'ঠিক করেছ, লেফটেন্যান্ট। সুযোগ না দিয়ে ভালই করেছ। এরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর লোক। এদের কোন রকম সুযোগ দিতে হয় না।' চেয়ারটা ঘরঘর করে পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল রাম নারায়ণ। টেবিল ঘুরে হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল আলতাফের সামনে। 'এই সেই মোটা গর্দভটা, না? এ বোধহয় অতখানি ভয়ঙ্কর না?'

'এ-ও ভয়ঙ্কর- তবে শুধু ওর বন্ধুদের জন্যে। নিজের এক তিল সুবিধা দেখলে নিজের বাপের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করবে,' ঋজু ভঙ্গিতে বলল অলোক রায়।

'এ আবার আমাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাইছে, অ্যাঁ?' আলতাফের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিহে, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না তো আবার?' ডান হাতটা মুঠি করে তুলল ওপর দিকে, তারপর ধারাল একটা আংটি দিয়ে একটানে আলতাফের গাল চিরে দিল। দীর্ঘ একটা চিহ্ন মুহূর্তে লাল হয়ে উঠল। ব্যথায় ককিয়ে উঠল আলতাফ, এক হাতে চেপে ধরল রক্তাক্ত গাল, অন্য হাতটা মাথার ওপর উঠিয়ে নির্ল আত্মরক্ষার অভিনয় করল।

'ঠিকই ধরেছ তুমি, লেফটেন্যান্ট। মাছ খেয়ে খেয়ে কেবল ঢোঁশকা হয়েছে। ভীতুর ডিম। বিরাট শরীর দিয়ে প্রকৃতি সাহসটা নিল্ করে দিয়েছে। এখানেও সেই ভারসাম্য। বেশির ভাগ মোটা লোকই এরকম। কি নাম তোমার, বীরপুরুষ?'

'মহাবীর,' বলল আলতাফ ভয়ে ভয়ে। 'আমার নাম মহাবীর নাথুরাম।' হাতটা গাল থেকে সরিয়ে চোখের সামনে ধরল আলতাফ। রক্ত দেখে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে ওর মুখ, চোখ দুটো বিস্ফারিত। প্যান্টের পেছনে মুছে আবার হাত দিল সে গালে। রাম নারায়ণের মুখে চারকোনা গর্ত সৃষ্টি হলো।

'রক্ত সহ্য হয় না তোমার, তাই না, মহাবীর? বিশেষ করে সে রক্ত যদি নিজের হয়? কিন্তু এটা তো বীরের লক্ষণ নয়। মহাবীর নাম কে দিল তোমার?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল আলতাফ, তারপর হঠাৎ চাইল রাম নারায়ণের দিকে। মুখের চেহারাটা বিকৃত হয়ে গেছে দুঃখের চোটে। মনে হলো এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে সে।

'হুজুর, আমি একজন গরীব জেলে। দিন আনি দিন খাই। রক্ত দেখিনি কোনদিন, দেখতে চাই-ও না। হুজুর, অদৃষ্টে কি লেখা আছে সে কেবল ভগবানই জানেন। আপনি হাসছেন, আমার কান্না পাচ্ছে। ভগবান!- আমাকে এই বিপদের মধ্যে কেন ফেললে, ভগবান!' টপ্ টপ্ করে দু'ফোঁটা পানি পড়ল আলতাফের গাল বেয়ে। অভিনয়টা এত সুন্দর আর আন্তরিক হয়েছে

যে ওর দুঃখে রানারই বুকটা উথলে উঠতে চাইল।
'সবাই অদৃষ্টের দাস,' বলল রাম নারায়ণ বিজ্ঞের মত। 'তুমি তাহলে জেলে একজন?'
'মিথ্যাবাদী! ব্যাটা বিশ্বাসঘাতক!' গর্জে উঠল রানা। আলতাফের ওপর থেকে কর্নেলের মনোযোগ সরিয়ে দিল সে। ঝট করে ঘুরে রানার সামনে এসে দাঁড়াল কর্নেল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল বিষণ্ন দৃষ্টি মেলে।
'মেজর মাসুদ রানা! ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! এত বুদ্ধি, এত সাহস, এত বীরত্ব? অথচ শেষ পরিণতি কি? দ্বারোকা দুর্গের ফাঁসিকাঠ। কি দুঃখজনক, তাই না?'
রানা জবাব দিল না কোনও। আবার জিজ্ঞেস করল কর্নেল, 'কি ভাবছ, মাসুদ রানা? ভাবছ বরাবরের মত এবারও আশ্চর্য ভাগ্যের জোরে বেঁচে ফিরে যাবে পাকিস্তানে?'
'না। এসব কিছুই ভাবছি না আমি। তোমার মুখটা খুব পরিচিত লাগছে আমার কাছে, ভাবছি কোথায় দেখেছি আগে।'
তুমি করে সম্বোধন করায় লাল হয়ে উঠল রাম নারায়ণের কান। চোখে রাগের আভাস ফুটে উঠল। এতখানি Eদ্ধত্য আশা করেনি সে বন্দীর কাছ থেকে। কিন্তু সামলে নিল সে।
'তাই নাকি? দেখেছ কোথাও আমাকে? হয়তো কলকাতায়…'
'এইবার মনে পড়েছে স্পষ্ট,' বাধা দিল রানা। আলতাফের ওপর থেকে কর্নেলের মনোযোগ সরাবার জন্যে ঝুঁকিটা নিয়েই ফেলল সে। 'ঠিক বলেছ। কলকাতায়। আলীপুর চিড়িয়াখানার বাঁদরের খাঁচায় লাফালাফি করতে দেখেছি তোমাকে। আমার পরিষ্কার মনে আছে কলাও খাইয়েছিলাম একটা। সেখানে…'
হঠাৎ থেমে মাথাটা সরিয়ে নিল রানা। রাগে দাঁত বেরিয়ে গেছে কর্নেল রাম নারায়ণের। দেহের সর্বশক্তি দিয়ে ঘুসি চালিয়েছিল সে, কিন্তু রানা সরে যেতেই শূন্যে ঘুরে গেল মুঠিটা রানার নাকের সামনে দিয়ে। দেহের ভারসাম্য হারিয়ে হোঁচট খেলো সে একবার, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। সাথে সাথেই রানার বুটের এক প্রচণ্ড লাথি পড়ল ওর হাঁটুর ওপর। ব্যথায় আর্তনাদ করে পড়ে গেল কর্নেল মাটিতে। উঠে দাঁড়াল সে আবার। চিতাবাঘের মত এগিয়ে যাচ্ছিল সে রানার দিকে ঘুসি পাকিয়ে, কিন্তু ব্যথা পাওয়া পা-টা মাটিতে পড়েই ভাঁজ হয়ে গেল সামনের দিকে- আবার পড়ে গেল সে মাটিতে।
ঘরের মধ্যে যেন বাজ পড়েছে, এমনি নিথর নিস্পন্দ হয়ে রইল প্রত্যেকটি লোক। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই যেন বুদ্ধি হারিয়ে থমকে গেছে।
নড়ে উঠল রাম নারায়ণ। টেবিলের কোণা ধরে উঠে দাঁড়াল সে। মুখটা

রক্তশূন্য। কোনও দিকে না চেয়ে টেবিলের কিনারা ধরে ধরে নিজের আসনে ফিরে যাচ্ছে সে এখন। ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলছে হিংস্র দুই চোখ।
মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল রানা। পরিষ্কার বুঝতে পারল সে, পরিষ্কার বুঝতে পারল ঘরের প্রতিটা লোক, রাম নারায়ণের চোখে হত্যার নেশা। নিজের ওপরই রাগ হলো রানার- সত্যিই একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে সে। রানা বুঝল, দু'জনের মৃত্যু দেখতে হবে ওর আগামী পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে। রাম নারায়ণ আর আলতাফ দু'জনেই মারা যাবে। রাম নারায়ণ মরবে আলতাফের ছুরিতে, আলতাফ মরবে গার্ডদের গুলিতে। কিছুই কি করবার নেই রানার?
রানা দেখল জামার হাতায় গালের রক্ত মুছছে আলতাফ। অর্থাৎ ওর হাতের দুই ইঞ্চির মধ্যে আছে ছুরিটার বাঁট। চোখটা কাত করে দেখল রানা সবচেয়ে কাছের প্রহরীটা ওর থেকে ছয় সাত ফুট দূরে দাঁড়ানো। ওর কাছে পৌঁছবার আগেই ওর হাতের সাব-মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে ওর বুক। কিন্তু চেষ্টা করতে হবে।
একটা ড্রয়ার টান দিয়ে পিস্তল বের করল কর্নেল। ল্যুগার। রিলিজ বাটন টিপতেই সড়াৎ করে বেরিয়ে এল গুলি ভর্তি ম্যাগাজিন। একবার পরীক্ষা করে নিয়েই ক্লিক করে ঢুকিয়ে দিল সে ম্যাগাজিনটা যথাস্থানে। একবার পাইড টানতেই চেম্বারে চলে এল একটা গুলি। এবার চোখ তুলে চাইল সে রানার দিকে। আলতাফের দিকে চাইল রানা, পেছন দিকে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইল। এমন সময় রানা দেখল ঘাড়ের কাছ থেকে হাতটা সরিয়ে আনল আলতাফ- ছুরি নেই সে হাতে।
টেবিলের কাছে একটা ধস্তাধস্তির আওয়াজ পাওয়া গেল। চোখ ফিরিয়ে রানা দেখল অলোক রায় চেপে ধরে আছে রাম নারায়ণের হাতটা। পিস্তলের মুখ টেবিলের দিকে ফেরানো।
'এভাবে মারবেন না, স্যার! মাথাটা ঠিক রাখুন, স্যার! আপনার বিপদ হবে!'
'হাত সরিয়ে নাও!' হিস্ হিস্ করে উঠল কর্নেলের কণ্ঠস্বর। এক মুহূর্তের জন্যেও চোখ জোড়া সরাল না রানার চোখ থেকে। 'হাত ছাড়ো বলছি, লেফটেন্যান্ট! নইলে তোমাকেও যেতে হবে ওই একই রাস্তায়।'
'ওকে মারলে আপনি বিপদে পড়বেন, স্যার। ব্রিগেডিয়ারের অর্ডার আছে দলপতিকে জ্যান্ত ধরে আনতে হবে। সমস্ত প্ল্যান বের করতে হবে ওর কাছ থেকে।'
স্পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন গুলি খেয়ে মরেছে ও,' বলল রাম নারায়ণ কর্কশ গলায়।
'এ যুক্তি টিকবে না। এদের সবাইকে তো আর মারতে পারবেন না। এরা সাক্ষ্য দেবে আপনার বিরুদ্ধে।' হাতটা ছেড়ে দিল সে রাম নারায়ণের।

চাপা গলায় বলল, 'জ্যান্ত চেয়েছে ব্রিগেডিয়ার, কিন্তু কতখানি জ্যান্ত তা বলেনি। যদি আমরা বলি তথ্য বের করতে গিয়ে আধমরা করতে হয়েছে, সেটা যুক্তিসঙ্গত হবে।'

সামলে নিল নিজেকে কর্নেল। সৎ পরামর্শের জন্যে ভেতর ভেতর কৃতজ্ঞতা বোধ করলেও কেন যেন সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল ওর অলোক রায়ের ওপর।

'দিলে তো সব পণ্ড করে। ওকে ভয় দেখিয়ে কথা আদায় করবারই চেষ্টা করছিলাম আমি। আমাকে আণ্ডারএস্টিমেট করাটা তোমার পক্ষে Eদ্ধত্য। মনে রেখো, লেফটেন্যান্ট আর কর্নেলের মধ্যে আসমান জমিন তফাৎ আছে। ভবিষ্যতে আর একবার যদি নিজের ক্ষমতার সীমা ল`ঘন করো, তবে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।' পিস্তলটা টেবিলের ওপর রেখে রানার দিকে ফিরে চারকোনা হাসি হাসল রাম নারায়ণ। কিন্তু এইসব বাজে কথায় রানা ভুলল না। পরিষ্কার বুঝল, ওর প্রাণ রক্ষা করেছে আজ অলোক রায়।

আবার রানার সামনে এসে দাঁড়াল রাম নারায়ণ। এবার রানার পায়ের আওতার বাইরে।

'এবার কাজের কথায় আসা যাক, মেজর রানা। অঢেল সময় নেই আমার হাতে।'

রানা চুপ করে রইল। একবার রাম নারায়ণের মুখের দিকে চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। কর্নেলের চোখে অশুভ বার্তা। ভেতরের পশুটা বেরিয়ে আসতে চাইছে বাইরে।

'এক্সপ্লোসিভ কোথায় রেখেছ?'

'এক্সপ্লোসিভ? সে আবার কি জিনিস?'

'মনে পড়ছে না?'

'কি বলছ ভাল করে বুঝতেই পারছি না। কিসের এক্সপ্লোসিভ?'

'তুমি?' মিশ্রী খানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল কর্নেল। 'তুমি বুঝতে পারছ আমার প্রশ্ন?'

স্পানির মত,' জবাব দিল মিশ্রী খান।

'কোথায় বাক্স দুটো?'

'ওই যে ময়দানটা, যেখানে রোজ মরা গরুর নাড়ী টেনে বের করে খাও তুমি আকাশ থেকে নেমে, ওইখানে রেখে দিয়েছি। গলা-ছেলা ধাড়ি শকুন কোথাকার!'

হাত দুটো মুঠি করে সহ্য করে নিল নারায়ণ। অপদস্থতার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্যে সরে গেল সে ঘরের মাঝখানে। এদের কাছ থেকে কথা বের করা যাবে না।

'এদের মধ্যে সহযোগিতার ভাব দেখা যাচ্ছে না মোটেও, তাই না,

অলোক?'

'এদের জিজ্ঞেস করার চাইতে ঘরের দেয়ালকে জিজ্ঞেস করাও ভাল, স্যার। অন্তত অভদ্র ব্যবহার তো করবে না।'

'ঠিক বলেছ, অলোক। এরা একটু অভদ্র। কিন্তু তথ্যটা আমার বের করতেই হবে- এবং তিন মিনিটের মধ্যে। বলো দেখি কি করে বের করা যায়?' ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরাল সে। তারপর দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল মাহবুবের দিকে। একটানে চাদর উঠিয়ে ফেলল সে মাহবুবের গায়ের ওপর থেকে। তারপর কেউ কিছু বোঝার আগেই ধাঁই করে একটা কিল মারল মাহবুবের ভাঙা পায়ের ওপর। ব্যথায় কুঁকড়ে গেল মাহবুবের দেহটা, কিন্তু একবিন্দু শব্দ বেরোল না ওর মুখ থেকে। সম্পূর্ণ সজাগ আছে সে এখন, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে সহ্য করল সে এই অবর্ণনীয় ব্যথা। রক্ত গড়িয়ে পড়ল ঠোঁট কেটে, কিন্তু টুঁ শব্দ করল না মাহবুব।

'সাবধান, রাম নারায়ণ!' রানার চাপা কণ্ঠস্বরে দারুণ উত্তেজনা প্রকাশ পেল। ভয়ানক কঠোর হয়ে গেছে ওর মুখটা। 'এর জন্যে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে তোমাকে।'

'কঠিন শাস্তি, তাই না?' আবার ভাঙা পায়ে আঘাত করল কর্নেল নিষ্ঠুর, নির্বিকার ভাবে। 'তাহলে? শাস্তিটা আরও কঠিন হয়ে গেল, তাই না, মাসুদ রানা?' চারকোনা বীভৎস হাসি হাসল সে। 'একটা জিনিস আমি বরাবর লক্ষ করেছি মেজর, পাকিস্তানীরা যতই দুর্দান্ত আর দুর্ধর্ষ হোক না কেন, মনটা তাদের খুবই নরম। কারও কষ্ট সহ্য করতে পারে না তারা।' মাহবুবের স্প্লিন্ট বাঁধা ব্যাণ্ডেজের কাছে চলে গেল কর্নেলের হাত। স্পাঁচ সেকেণ্ড সময় দিলাম। টিএনটি-র বাক্স কোথায় আছে বলে ফেলো, নইলে··· তোমার আবার কি হলো, মোটা গাধা?'

কয়েক পা এগিয়ে এসেছে আলতাফ। কর্নেলের কাছ থেকে একগজ দূরে দাঁড়িয়ে টলছে সে।

'আমাকে···আমাকে বাইরে নিয়ে চলো।' দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে সে। একটা হাত গলায় আরেক হাতে পেট চেপে ধরেছে সে। 'বমি হয়ে যাবে। সহ্য করতে পারছি না। ভগবান! বাতাস, বাতাস···'

'বাইরে যাবে কেন, মহাবীর? মজা দেখো···সেন্ট্রি! জলদি ধরো!' আলতাফের দুই চোখ কপালে উঠেছে, চোখের সাদা অংশ শুধু দেখা যাচ্ছে। 'ব্যাটা ভীতুর ডিম অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। বাইরে নিয়ে যাও ওকে।'

রানা দেখল দু'জন প্রহরী ছুটে যাচ্ছে আলতাফের দিকে। ভয়ে বিবর্ণ আরীফের মুখ। নাজির বেগ নির্বিকার। চট্ করে চাইল সে মিশ্রী খানের দিকে। মিশ্রীর চোখের পাপড়ি দুটো সামান্য একটু নামল নিচে। রানা বুঝল চতুর পাঞ্জাবী বুঝে নিয়েছে ব্যাপারটা- এবং প্রস্তুত আছে।

দু'জন গার্ড ছুটে এসে ধরল আলতাফকে। দুই জনের দুই কাঁধে দুই

হাত রাখল আলতাফ। চোখের কোণ দিয়ে দেখল রানা ওর পেছনের সেন্ট্রিটা এখন মাত্র চার ফুট দূরে। ওর সমস্ত মনোযোগ আলতাফের ওপরে, সাব-মেশিনগানটা ঝুলছে নিচের দিকে মুখ করে। রানা বুঝল, কিছু আন্দাজ করার আগেই আঘাত করতে পারবে সে ওকে।

আলতাফের হাত দুটো দুই সেন্ট্রির গলার কাছে ঝুলছে। হঠাৎ উঁচু হয়ে ফুলে উঠল আলতাফের প্রকাণ্ড কাঁধের পেশী দুটো। সাথে সাথেই ঝাঁপ দিল রানা। অসতর্ক সেন্ট্রির পেটের ওপর ভয়ঙ্কর বেগে আঘাত করল রানা ডান কাঁধ দিয়ে। বুকের হাড়ের এক ইঞ্চি নিচে। তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ করে ছিট্‌কে পড়ল লোকটা কাঠের আলমারির ওপর, সেখান থেকে মাটিতে।

ঝাঁপ দেয়ার সময়ই দুটো মাথার প্রচণ্ড সংঘর্ষের শব্দটা শুনতে পেয়েছে রানা। একটু ঘুরতেই চোখে পড়ল ওদের পেছনে দাঁড়ানো দ্বিতীয় প্রহরীটা ঘুরে পড়ে গেল মাটিতে তলপেট বরাবর মিশ্রী খানের বুটের একটা বিশ্রী লাথি খেয়ে।

আলতাফ ততক্ষণে বাম পাশের মূর্ছিত প্রহরীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে একখানা অটোমেটিক কারবাইন। সোজা রাম নারায়ণের বুকের দিকে সেটা ধরা এখন।

সবটা ব্যাপার এত দ্রুত এত অনায়াসে ঘটে গেল যে তাজ্জব বনে গেল ঘরের প্রতিটা লোক। নিস্তব্ধতা থম থম করতে থাকল ঘরটার মধ্যে। পরমুহূর্তে গর্জে উঠল অটোমেটিক কারবাইন। পর পর তিনটে গুলি করল আলতাফ কর্নেলের হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে। দড়াম করে দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেলো কর্নেলের দেহটা, তারপর পড়ে গেল মাটিতে। বেঞ্চের কোণায় ঠাস করে বাড়ি খেলো কপালটা, কিন্তু ব্যথার বোধ তখন আর নেই কর্নেলের, প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে আগেই। চিৎ হয়ে পড়ে গেল সে মাটিতে। চোখ দুটো খোলা। তেমনি বিষণ্ন ভাবলেশহীন দৃষ্টি সে চোখে।

কারবাইনটা লেফটেন্যান্ট অলোক রায় আর তার পেছনে দাঁড়ানো শান্তার দিকে ধরে থেকেই জামার ভেতর থেকে ছুরি বের করে আনল আলতাফ একটা। রানার হাতের বাঁধন কেটে দিয়ে বলল, 'কারবাইনটা একটু ধরবে, মেজর?'

শক্ত বাঁধুনিতে আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া হাত দুটো বার দুই ঝাড়া দিয়ে কারবাইনটা নিল রানা আলতাফের হাত থেকে। এই ঘরের পাশে আরেকটা ঘর আছে। মাঝের দরজাটা ভেজানো, সেই দিকে এগোল আলতাফ। দরজার কাছে গিয়েই হঠাৎ সরে গেল সে দেয়ালের গায়ে। ইশারায় রানাকেও পিছিয়ে যেতে বলল।

হঠাৎ দু'পাট খুলে গেল দরজা। একটা রাইফেলের ব্যারেল দেখতে পেল রানা।

'লেফটেন্যান্ট! কোনও গোলমাল...' আর কথা বেরোল না ওর মুখ দিয়ে। আলতাফের বুটের লাথিতে দড়াম করে একটা কপাট লাগল ওর কপালে। পড়ে যাচ্ছিল, আলতাফ ধরে নামিয়ে দিল মেঝেতে আস্তে করে। রাইফেলটা তুলে নিল মাটি থেকে। দুই তিন সেকেণ্ডে ঘরটা অনুসন্ধান করে ফিরে এল আলতাফ এ ঘরে।

'কেউ নেই আর ও ঘরে, মেজর।'

'বেশ। এবার বাকি সবার বাঁধন কেটে দাও, আলতাফ।'

'শাব্বাশ, ভাতিজা!' আলতাফকে অভিনন্দন জানাল মিশ্রী খান। এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত বিস্তারিত হলো ওর হাসি। হাতের বাঁধন কেটে দিতেই প্রথমে গোঁফে তা দিল সে।

'আরীফ!' রানা ঘুরল আরীফের দিকে। ভক্তি আর শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠেছে আরীফের বিস্মিত আয়ত দুই চোখে। 'সোলজাররা কোথায় থাকে, আরীফ?'

'এই কম্পাউণ্ডের মাঝামাঝি জায়গায়। এটা অফিসারদের কোয়ার্টার।'

'কম্পাউণ্ডের সবটাই তার দিয়ে ঘেরা?'

'হ্যাঁ। দশ ফুট উঁচু কাঁটা তার।'

'বেরোবার রাস্তা?'

'একটাই রাস্তা। গার্ড দু'জন।'

'বেশ। আলতাফ সবগুলোকে পাশের ঘরে পাচার করো। না না, তুমি থাকো, অলোক রায়। ওই চেয়ারটায় বসো। এক্ষুণি কোনও লোক ছুটে আসবে গুলির শব্দ শুনে অনুসন্ধান করতে। তাকে বলবে আমাদের একজন পালাতে যাচ্ছিল, তুমি গুলি করে মেরেছ। ওকে দিয়েই গেটের গার্ড দু'জনকে ডেকে পাঠাবে।'

রাম নারায়ণের পিস্তলটা তুলে নিল রানা। অলোক রায় দেখছে অবলীলাক্রমে দু'জন গার্ডের কলার ধরে ঝুলাতে ঝুলাতে নিয়ে যাচ্ছে আলতাফ পাশের ঘরে। এবার ফিরল সে রানার দিকে।

'আমার একটা ভুলের জন্যে কী আশ্চর্য ক্ষতি হয়ে গেল! কি বলছিলেন, ও, আপনার আদেশ আমি পালন করব না।'

'আলতাফ!' ডাকল রানা।

'বলো, মেজর।' পাশের ঘরের দরজা জুড়ে দাঁড়াল আলতাফ।

'আমি একজনের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, ছুটে আসছে এইদিকে। পাশের ঘরে বাইরে বেরোবার দরজা আছে?'

'আছে।'

'বেরিয়ে যাও বাইরে। ছুরি নাও সাথে। যদি লেফটেন্যান্ট...' ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে আলতাফ। অলোক রায়ের দিকে ফিরল রানা।

'যা বলছি তাই করতে হবে তোমাকে। যদি না করো তাহলে বাইরের

লোকটাকে খুন করবে আলতাফ, তারপর তোমাকে এবং এখানকার গার্ড-গুলোকে…' কথা বলতে বলতে সরে গেল রানা পাশের ঘরে। রাইফেলটা ধরাই আছে অলোক রায়ের দিকে। 'তারপর গেটের সেন্ট্রি দু'জনকেও হত্যা করা হবে ছুরি মেরে। আট নয়জন মারা যাচ্ছে- এদের সবার জীবন নির্ভর করছে এখন তোমার ওপর। এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, যে করে হোক পালাবই আমরা এখান থেকে। এসে গেছে…' ফিস ফিস করে বলল রানা, 'ভেবে দেখো, আটটা মৃতদেহ! কেবল তোমার অহঙ্কার চরিতার্থ করতে গিয়ে!' অলোক রায়ের রক্তশূন্য মুখের দিকে স্থির নিষ্পলক নেত্রে চেয়ে রইল রানা। মনে মনে বুঝল জয় হয়েছে ওর।

ঝটাং করে খুলে গেল দরজার দুই পাট। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে একজন সোলজার।

'লেফটেন্যান্ট! গুলির শব্দ শুনলাম?'

'ও কিছু নয়, সার্জেন্ট। বন্দীদের একজন পালাবার চেষ্টা করেছিল-গুলি করে মেরেছেন ওকে কর্নেল।'

'ডাক্তারকে খবর দিতে হবে?'

'ডাক্তার এসে কিছুই করতে পারবে না। করবার কিছুই নেই। তুমি বরং গেটের সেন্ট্রি দু'জনকে এক মিনিটের জন্যে ডেকে দিয়ে বিশ্রাম করতে যাও। সারারাত তো তোমাদের কারও ঘুম হয়নি।'

'অন্য দু'জনকে ততক্ষণ গার্ড দেবার জন্যে পাঠাব?'

'না। এক মিনিটের ব্যাপার। তাছাড়া যাদের জন্যে গার্ডের ব্যবস্থা, তারা এখন এই ঘরেই বন্দী।' অসহিষ্ণু কণ্ঠে আবার বলে উঠল লেফটেন্যান্ট, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও জলদি।'

সার্জেন্টের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল দূরে। দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা।

'ধন্যবাদ, লেফটেন্যান্ট। তোমাকে দিয়ে এই কাজটা করাতে হলো বলে আমি দুঃখিত। আলতাফ, টেলিফোনের তারগুলো কেটে দেবার ব্যবস্থা করো তুমি আর নাজির। তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, রওনা হব আমরা একটু পরেই।'

ছুটে চলে গেল আলতাফ। প্রকাণ্ড শরীরটা যেন ওর পালকের মত হালকা। বিস্মিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল অলোক রায় ওর গমন পথের দিকে। ফোঁশ করে নিঃশ্বাস ফেলল একটা। এমন বোকা বনেনি সে জীবনে কখনও আর।

দশ মিনিটের মধ্যে গেটের সেন্ট্রি দু'জনের রাইফেল কেড়ে নিয়ে বেঁধে ফেলা হলো হাত-পা। কাপড় গুঁজে দেয়া হলো মুখের মধ্যে। অলোক রায়েরও সেই একই অবস্থা। মাহবুবের পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা।

'রওনা হব এখন আমরা, মাহবুব, খুব কি কষ্ট হবে?'

'কিছু না, স্যার। আপনারা তৈরি হলেই আমিও তৈরি। পায়ে আর

কোনও বোধই নেই- ব্যথা লাগবে কোথায়?' হাসল মাহবুব। আরীফ আর মিশ্রী খানের জোগাড় করে আনা স্ট্রেচারে শুয়ে আছে সে পরমানন্দে। 'এবার তো রীতিমত সৌখিন চালে চলব। আহত অফিসারের মত।'

বেরিয়ে এল ওরা মিলিটারি কম্পাউণ্ড থেকে। বাধা দিল না কেউ। দ্বারোকা আর তিন মাইল।

হারিয়ে গেল ওরা রাজগড়ের জঙ্গলে।

এগারো

'ওই পাহাড়ের ওপর একটা উপত্যকা আছে। ওখানেই একটা গুহা পাব আমরা- পাহাড়টা আর ডিঙাতে হবে না আমাদের। ওপারে পৌঁছলেই দ্বারোকা দুর্গের পৌনে এক মাইলের মধ্যে চলে যাব। কোনও মতে শহর পর্যন্ত গেলেই আর চিন্তা নেই।'

'আর পারব না হে, ছোকরা।' মাটিতে বসে পড়ল মিশ্রী খান। 'এঞ্জিনের মধ্যে খানিক কয়লা না ভরলে চলবে না এটা আর এক পা-ও। সেই সকাল থেকে মুখ বুজে আছি, আর না।'

'সকাল থেকে মুখ বুজে আছেন?' বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল আরীফ মিশ্রী খানের দিকে। পরম তৃপ্তির সাথে গোঁফে তা দিচ্ছে সে। 'আমি তো এক মিনিটও মুখ বুজতে দেখলাম না আপনাকে। এক পিনে আশী রেকর্ড বাজিয়ে চলেছেন সেই রওনা হবার পর থেকেই। এখন বরং খানিকটা মুখ বুজে থাকুন। চোখও বুজতে পারেন ইচ্ছে করলে- কারণ সন্ধে না নামলে ওই উপত্যকায় ওঠাই যাবে না।'

'কিন্তু তুমি না বলেছিলে দ্বারোকা রাজকোট থেকে মাত্র তিন মাইল? ঝাড়া ছয় ঘণ্টা হেঁটেও তিন মাইল পুরো করতে পারলাম না?'

'তিন মাইল সোজাসুজি গেলে। আমরা বারো মাইল ঘুরে যাচ্ছি।'

'কি বললে?' শুয়ে পড়েছিল মিশ্রী খান, চট্‌ করে উঠে বসল। 'বারো মাইল হাঁটিয়েছ? সেরেছে রে, সেরেছে! বারো মাইল! শরীরের ভেতর নিশ্চয়ই কিছু ভজঘট হয়ে গেছে। আমি তো তিন মাইল মনে করে…'

'সন্ধে পর্যন্ত তাহলে রেস্ট?' রানা আর আলতাফ বয়ে আনছিল মাহবুবের স্ট্রেচারটা। সেটা নামিয়েই আদেশ দিল রানা, 'এই খোলা জায়গায় শুয়ে পড়ো না মিশ্রী খান, ওই ঝর্ণার ধারে গাছের তলায় বিশ্রাম নেব আমরা।'

একটানা এতদূর আসেনি ওরা। মাঝে ভারতীয় সৈন্যদের ট্রেনিং-এর জন্য খোঁড়া একটা ট্রেঞ্চের মধ্যে মাহবুবকে নামিয়ে লতা-পাতা দিয়ে ঢেকে

কয়েকটা জরুরী কাজ সেরে নিয়েছে। আলতাফ আর আরীফ সেই পাহাড়ে ফিরে গিয়ে এক্সপ্লোসিভের বাক্স দুটো নিয়ে এসেছে, মিশ্রী খান মিলিটারি গ্যারেজে ঢুকে ওদের ট্রাকগুলোর ইগনিশন্ কয়েল আর ডিস্ট্রিবিউটার নষ্ট করে দিয়ে এসেছে, নাজির বেগ গ্রামে গিয়েছিল মাহবুবের জন্য কিছু ওষুধ যোগাড় করে আনতে- কিন্তু বেচারা ভুল ওষুধ নিয়ে ফিরেছে। আর রানা একটা টিলার মাথায় চড়ে দূরবীন লাগিয়ে মিলিটারিদের গতিবিধি লক্ষ করেছে।

রানারা বেরিয়ে আসবার আধঘণ্টার মধ্যেই একজন পত্রবাহক সেন্ট্রি অফিসারস কোয়ার্টারে এসে উপস্থিত হওয়ায় ছাড়া পেয়েছে লেফটেন্যান্ট অলোক রায় ও অন্যান্য গার্ডরা। উত্তেজিত ভাবে প্রত্যেককে প্রস্তুত হয়ে নেবার আদেশ দিয়েছে লেফটেন্যান্ট। গ্যারেজে গিয়ে দেখা গেল সব ট্রাকই অকেজো হয়ে পড়ে আছে। মার্চ করে বেরিয়ে পড়েছে ওরা দ্বারোকা যাবার সোজা পথ ধরে। সঙ্গে ফিল্ড টেলিফোনও নিয়েছে অলোক রায়।

রানার ঘড়িতে এখন বাজে বেলা একটা। আরও পাঁচ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে সূর্যাস্তের জন্যে। মাহবুবের পা-টা একবার পরীক্ষা করে দেখেছে রানা ও মিশ্রী খান, পরস্পরের দিকে চেয়ে হেসেছে, মাহবুবকে আশ্বাস দিয়েছে, প্রায় শুকিয়ে এসেছে ঘা-টা। আসলে কালো হয়ে গেছে সারাটা পা- বিশ্রী গন্ধ ছুটেছে পচে ওঠায়। বেঁধে দিয়েছে আবার ব্যাণ্ডেজ। পালা করে প্রহরার ব্যবস্থা হয়েছে। আলতাফ, মিশ্রী আর মাহবুব ঘুমাচ্ছে একটা ঝোপের আড়ালে, আরীফ শুয়ে আছে বাঁকা একটা পাথরের চাঁইয়ের ছায়ায়। নাজির বেগ জোর করে রানাকে বিশ্রাম করতে পাঠিয়ে দিয়েছে। এদিক-ওদিক চেয়ে আরীফের পাশে শুয়ে পড়ল রানা। অনেকক্ষণ জেগে রইল। ঘুম আসছে না চোখে। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে নাজির বেগ। অলস চোখে চেয়ে দেখছে রানা। একটা লম্বা গাছে উঠে গেল নাজির বেগ চারপাশটা ভাল ভাবে দেখবার জন্যে। নাহ্, খানিকটা ঘুমিয়ে নেয়া দরকার, এমন সুযোগ আর না-ও আসতে পারে।

ঘুমের ঘোরে আরীফের গায়ে একটা হাত পড়তেই মুহূর্তে জেগে গেল রানা। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সরে এল রানার হাতটা। অবাক চোখে চেয়ে রইল সে কিছুক্ষণ আরীফের ঘুমন্ত মুখের দিকে। ভাল করে লক্ষ করে দেখল আরীফের কানের লতিতে ছোট্ট একটা ফুটো দেখা যাচ্ছে। মৃদু হাসি ফুটে উঠল রানার মুখে। তাহলে এই ব্যাপার! গতকাল বগল তলায় হাত দিয়ে ওর জ্ঞানহীন দেহটা তুলতে গিয়ে কেমন খট্কা লেগেছিল- আজ বোঝা গেল। পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

'মেজর রানা! শিগগির ওঠেন!' কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিচ্ছে আরীফ।

'কি ব্যাপার, আরীফ?' উঠে বসল রানা। দেখল উত্তেজিত উদ্বিগ্ন আরীফের চোখ মুখ। এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল সে।

'প্লেন! অনেকগুলো প্লেন আসছে এইদিকে।'

ফাঁকা জায়গায় এসেই দেখতে পেল রানা প্লেনগুলো। দশটা। পাঁচটা পাঁচটা করে দুই সারিতে আসছে এদিকেই- মাত্র দু'হাজার ফুট উঁচু দিয়ে। মিগ জেট। মুহূর্তে বিপদ টের পেল রানা। সাধারণ বিচার-বুদ্ধিতে সে বুঝল এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ওরা কোথায় লুকিয়ে আছে তা ভারতীয় প্লেনের জানবার কথা নয়। কিন্তু বিচার-বুদ্ধির ঊর্ধ্বে একটা বিশেষ অনুভূতি আছে রানার- তাই যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ ব্যতিরেকেও ভয় পেল সে। এবং বুঝল, বিপদ আসন্ন। হঠাৎ চোখে পড়ল রানার, প্রায় দু'শো গজ দূরে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে যাচ্ছে আলতাফ আর মিশ্রী খান মাহবুবের স্ট্রেচারটা বয়ে নিয়ে। আর অল্প কিছুদূর গেলেই পাহাড়ের নিরাপদ আশ্রয়। ব্যাপার কি? ওকে কিচ্ছু না জানিয়ে সবাই চলে যাচ্ছে কেন?

'তোমাকে কে ঘুম থেকে ওঠাল?'

'কেউ না, এমনি জেগে গেছি। কই, চলুন, এক্ষুণি এসে পড়বে প্লেন।' অসহিষ্ণুভাবে রানার হাত ধরে টান দিল আরীফ।

'নাজির বেগ কোথায়? ও-ই তো ছিল পাহারায়?'

'জানি না, জানি না। জল্দি করুন, মেজর রানা!' অস্থির হয়ে উঠল আরীফ। 'আর আধ মাইলও নেই। এসে গেছে প্লেন।'

ছুটল ওরা পাহাড়ের দিকে। বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা পার হয়ে পৌঁছতে হবে পাহাড়ী রাস্তায়। ওদের দেখতে পেলেই মেশিনগান চালাবে প্লেন থেকে। কিন্তু উপায় নেই, ঝুঁকিটা নিতেই হবে।

ডাইভ দিয়ে নেমে এল সামনের পাঁচটা প্লেন। বাকি পাঁচটা উড়ে গেল সোজাসুজি মাথার ওপর দিয়ে। শুয়ে পড়ল রানা মাটিতে, টেনে শোয়াল আরীফকেও।

'কানে আঙুল দাও, আরীফ। মাথা নিচু করে রাখো।'

পাঁচশো, চারশো, তিনশো ফুট নেমে এল জেটগুলো। এঞ্জিনের শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড়। আবার নাকগুলো উঁচু হলো পাঁচটা জেটের। উঠে গেল ওরা ওপরে। পনেরো বিশটা বোমা নেমে এল ঝর্ণার ধারে ঠিক যেখানটায় এতক্ষণ বিশ্রাম নিচ্ছিল ওরা সেই জঙ্গলের ওপর। কিন্তু বোমা যদি হবে তো শব্দ কোথায়? এমনি সময় কানে এল নাপাম বোমা ফাটবার শব্দ। উজ্জ্বল আলো দেখা গেল। কয়েক সেকেণ্ডেই ঘন কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল জঙ্গলটা। ধোঁয়ার ফাঁকে ফাঁকে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যাচ্ছে। মুহূর্তে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল জঙ্গলটা। কিন্তু এত ঘন কালচে ধোঁয়া কিসের?

একটু পরেই বোঝা গেল। টিয়ার গ্যাস। জঙ্গলের মধ্যে থেকে ওদেরকে

ফাঁকা জায়গায় বের করে নিয়ে আসতে চাইছে। ওরা জানে জঙ্গলের মধ্যে অন্য কোনও রকম বোমা ফেলে লাভ নেই।

দু'জনেই কাশতে আরম্ভ করল ভয়ানক ভাবে- দরদর করে পানি পড়ছে চোখ দিয়ে, কনকন করে উঠছে দু'চোখ বিষাক্ত ধোঁয়ার স্পর্শে।

পশ্চিমের বাতাসে ভেসে আসছে ধোঁয়াটা। অল্পক্ষণেই পার হয়ে যাবে। কিন্তু রানা বুঝল পার হতে দিলে চলবে না। এই ধোঁয়াই এখন ওদের বাঁচবার একমাত্র ভরসা। ধোঁয়া সরে গেলে ফাঁকা ময়দানে গুলি খেয়ে মরতে হবে, নয়তো পুড়ে মরতে হবে আগুনে। উত্তাপ বেড়েই চলেছে ক্রমে।

স্পালাও, আরীফ! আমার হাত ধরে রাখো। ধোঁয়ার মধ্যেই দৌড়াতে হবে।' ভয়ঙ্কর কাশি এসে বন্ধ করে দিল রানার কথা।

কিছু দেখা যাচ্ছে না চোখে, অন্ধের মত ছুটে চলেছে ওরা দু'জন। হোঁচট খাচ্ছে, পড়ছে, আবার উঠছে, আবার ছুটছে। ফুঁপিয়ে উঠছে দু'জন একটু বাতাসের জন্যে। একটু মুক্ত বাতাস। আর পারা যায় না। আবার এঞ্জিনের গর্জন শোনা গেল। ঠিক মাথার ওপর তিনশো ফুট উঁচুতে! ফিরে এসেছে ওরা আবার বম্বিং-এর জন্যে। এবার বম্বিং হলো সামনে। থমকে দাঁড়াল রানা। কেঁপে উঠল পৃথিবীটা। ঢলে পড়ল আরীফ।

হঠাৎ একটা কুলুকুলু শব্দে কান খাড়া হয়ে গেল রানার। বাম দিকে ফিরল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না চোখে। দাউ দাউ করে আগুন ধরে গেল সামনের জঙ্গলটায়। আর ভাববার সময় নেই। পাঁজাকোলা করে তুলে নিল রানা আরীফের জ্ঞানহীন দেহ। পাগলের মত ছুটল বামে। হালকা হয়ে এসেছিল পশ্চিমের টিয়ার গ্যাস, কিন্তু পা পিছলে ঝর্ণার মধ্যে পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত টের পেল না রানা যে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেছে।

অগভীর ঝর্ণা। কোমর পানি। গলা পর্যন্ত ডুবে থেকে ঠাণ্ডা পানি ছিটাল রানা আরীফের চোখে মুখে, নিজেও ধুয়ে নিল মুখটা। ভয়ঙ্কর গরম হয়ে উঠছে চারদিকের বাতাস। অনায়াসে পার হয়ে এল সে বারো ফুট চওড়া ঝর্ণাটা। ধোঁয়া সরে গেছে পুবে। বিকেলের পড়ন্ত রোদে রানা চেয়ে দেখল চলে যাচ্ছে প্লেনগুলো দ্বারোকা এয়ারফিল্ডের দিকে। আবার বোমা নিয়ে ফিরবে বোধহয়।

উঠে এল রানা ঝর্ণা থেকে। শুইয়ে দিল আরীফের জ্ঞানহীন দেহটা শুকনো মাটিতে। অনেকটা স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস নিচ্ছে সে এখন। আঁজলা ভরে পানি এনে জোরে চোখে-মুখে ছিটাতেই কেঁপে উঠল আরীফের চোখের পাতা। বার কয়েক মিট মিট করেই চোখ মেলে চাইল সে রানার দিকে, তারপর ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। দাউ দাউ করে জ্বলছে কয়েক জায়গায় টুকরো টুকরো জঙ্গল। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বলল, 'ওরা কোথায়? চলে গেছে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এক্ষুণি আবার ফিরে আসতে পারে। কেমন বোধ করছ,

আরীফ, হাঁটতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই,' বলেই উঠে দাঁড়াল আরীফ। দাঁড়িয়েই ঢলে পড়ে যাচ্ছিল, চট্ করে ধরে ফেলল রানা।

'ব্যাপার কি, আরীফ? তুমি আমাদের মধ্যে কেন? এই ভয়ঙ্কর গ্রুপের মধ্যে তো তোমাকে ঠিক মানায় না?'

চমকে গেল আরীফ, তারপর হাসল। বুঝল, ধরে ফেলেছে রানা। 'আমি আজ তিন বছর ধরে পুরুষের ছদ্মবেশে এই এলাকায় স্পাইং করছি। আহমেদাবাদ পর্যন্ত আমার এলাকা। জুনাগড়, মানবদ্দার, দ্বারোকা, জামনগর, রাজকোট…'

'বুঝলাম, বুঝলাম। কিন্তু পুরুষের ছদ্মবেশ কেন?'

'মেয়েলোকের অনেক রকমের বিপদ আছে, সেসব থেকে বাঁচবার জন্যে।'

'কি নাম তোমার? মানে আসল নাম?' ঠেলা দিল পেছন থেকে রানা ওকে এগোবার জন্যে। হাঁটতে আরম্ভ করল দু'জন।

'ইশরাত জাহান।'

'নামটা তো খাসা, নওয়াব ফ্যামিলির নাম মনে হচ্ছে!'

'আমি নওয়াব ফ্যামিলিরই মেয়ে।'

ঘাড় কাত করে একবার ইশরাত জাহানের মুখটা দেখল রানা। তারপর বলল, 'এখন জলদি আমাকে দলের আর সবার কাছে নিয়ে চলুন, নওয়াবজাদী।'

'ওদের কাছে আমার আসল পরিচয় বলে দেবেন না যেন আবার!'

'নাজির বেগ তো জানেই…'

'না। যদি ভবিষ্যতেও আমার এই অঞ্চলে থাকতে হয় তাহলে জানাজানি না হওয়াই ভাল।'

'এত কাণ্ডের পরও? আমার মনে হয় না এত সব ঘটনার পর তোমার এদেশে থাকা আর উচিত হবে। যাই হোক, পরের কথা পরে, এখন একটু জলদি পা চালাও, জাহান। ওই দেখো আবার আসছে প্লেন।'

একটা অস্টার প্লেন আসছে এইদিকে। পড়িমরি করে ছুটল ওরা।

হৈ-হৈ করে এগিয়ে এল মিশ্রী খান ওদের দিকে।

'ওস্তাদ! কোথায় ছিলেন, ওস্তাদ! আমরা এদিকে…'

'আমাকে ফেলে পালিয়ে এলে কেন তোমরা? আসবার সময় জাগিয়েও তো দিতে পারতে!' রানার কণ্ঠে তীব্র তিরস্কার।

থ হয়ে গেল মিশ্রী খান। জবাব পেল না খুঁজে। আলতাফই প্রথম কথা বলল।

'ঘুমিয়েছিলে তোমরা? আমরাও ঘুমিয়ে ছিলাম। একমাত্র মাহবুব জেগে ছিল। প্লেনের শব্দ পেয়েই ডেকেছে আমাদের। ঘুম থেকে জেগেই দেখলাম

নাজির বেগ উঠে যাচ্ছে পাহাড়ে। হুইস্‌ল্‌ দিয়ে সিগন্যাল দিতেই আমাদেরকে ডাকল ইশারায়। মনে করলাম তোমরাও উঠে গেছ পাহাড়ে…'

'নাজির বেগ কোথায়?'

জিজ্ঞেস করবার সাথে সাথেই দেখল রানা খোঁড়াতে খোঁড়াতে নামছে নাজির বেগ পাহাড় থেকে। ডান পা-টা জখম হয়েছে ওর।

'ওই যে আসছে, ওস্তাদ। আপনারা আমাদের সঙ্গে আসেননি দেখে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে ছুটে নেমে গেল ও নিচে- তখনও আমরা জানি না যে আপনারা ঝর্ণার ধারে পরম সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন। কিছুদূর নেমেই গুলি খেয়েছে ও পায়ে। নিজেই ব্যাণ্ডেজ করে উঠে এসেছে খোঁড়াতে খোঁড়াতে।'

'কি ব্যাপার, নাজির?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ব্যাপার খুবই খারাপ, স্যার।' রানাদের আবির্ভাবে বিস্ময়ের ধাক্কা সে দূর থেকেই সামলে নিয়েছে।

'কি হয়েছে?'

'ছ'টা আর্মার্ড কার আর দশটা কামান ফিট করা হাফ ট্রাক আসছে দ্বারোকা থেকে। আধ মাইলও নেই এখন। আর ওই দেখুন, একখানা অস্টার প্লেনে আমাদের গতিবিধি লক্ষ করা হবে।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল রানার। পাহাড়ের গুহার ছায়ায় প্লেন থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব কিন্তু ল্যাণ্ডফোর্স এলে ঠেকাবে কি করে? তার আগে কয়েকটা ব্যাপারে আরও পরিষ্কার হওয়া দরকার।

'নাজির, তুমি আমাকে আগেই ঘুম থেকে জাগাওনি কেন?'

'কাউকেই জাগাইনি আমি। গাছের মাথা থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম কি যেন এগোচ্ছে আমাদের দিকে, তাই ভাল করে দেখবার জন্যে পাহাড়ে উঠছিলাম। আমি যখন পাহাড়ের প্রায় মাথায় উঠে গেছি তখন দেখলাম প্লেন আসছে এদিকে। তখন আর কাউকে কিছু জানাবার উপায় নেই। কিন্তু যখন দেখলাম মিশ্রী খান আর ক্যাপ্টেন আলতাফ ঘুম থেকে উঠেছে তখন মনে করলাম ওরা আপনাদের নিশ্চয়ই জাগিয়ে দেবে। কিন্তু ওরা বলছে আমাকে পাহাড়ের ওপর দেখে ওরা মনে করেছিল আপনি, আমি, আরীফ তিনজনেই প্লেনের শব্দে ওদের ফেলেই পালিয়ে এসেছি পাহাড়ের নিরাপদ আশ্রয়ে।'

'তাই বলো। সবটা মিলেই ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। যাক্‌, এখন সবাই হারি আপ্‌! আরীফ তোমার সেই উপত্যকা আর কতদূর?'

স্পনেরো মিনিটের পথ। কিন্তু পা চালাতে হবে। একটা শর্টকাট রাস্তা আছে বড় রাস্তা থেকে ওই উপত্যকার গোড়া পর্যন্ত আসবার। ওরা যদি ওই পথে আমাদের আগেই সেখানে পৌঁছে যায় তাহলেই সব শেষ হয়ে যাবে।'

দ্রুত পা চালাল ওরা। মাহবুব আর নাজির বেগের ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু এদের কেউই পরাজয় স্বীকার করবে না। কারও মুখ থেকে একটি টুঁ শব্দ বেরোল না।

ঠিকই বলেছিল আরীফ। এই উপত্যকার উপরই নির্ভর করছে সব কিছু। ওখানে পৌঁছেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সবাই। মিশ্রী খান পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেল ওপরে ভারতীয় সৈন্যদের গতিবিধি লক্ষ করবার জন্যে। মাহবুবকে একটা গুহার মধ্যে শুইয়ে রেখে চারপাশে চেয়ে প্ল্যান ঠিক করে ফেলল রানা। বুঝিয়ে দিল আলতাফকে। মৃদু হেসে মাথা নাড়ল আলতাফ।

হঠাৎ একটা পচা দুর্গন্ধ নাকে এল এদের। নাকটা কুঁচকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'মাহবুবের এখন কি অবস্থা, আলতাফ?'

'মিশ্রী বলছে আজ রাত কাটবে না ওর। ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে গ্যাংগ্রিন। রাত পোহাবার আগেই মারা যাবে।'

'বড় কষ্ট পাচ্ছে বেচারা।'

'সকাল থেকে একবারও চোখের পাতা এক করেনি। অসাধারণ মানসিক শক্তি না থাকলে এতক্ষণ টিকতে পারত না। মরবে না, প্রতিজ্ঞা করেছে যেন ছেলেটা।'

মিশ্রী খান ফিরে এল প্রায় ছুটতে ছুটতে।

'ওস্তাদ! এসে গেছে ওরা। ওই যে নিচে গাছগুলো দেখা যাচ্ছে, ওখানটায় এসেই রাস্তা শেষ। হাফ-ট্রাকের কামানগুলো একেকটা লাইট পোস্টের সমান! আর দুই মিনিটেই দেখতে পাবেন।'

চমৎকার জায়গা বেছে নিয়েছে আরীফ। পাথরের আড়ালে একজন মেশিনগান নিয়ে বসলেই আর কারও সাধ্য নেই এগোবার। সাব-মেশিনগান আর ব্রেনগান নিয়ে প্রস্তুত হলো ওরা চারজন। পাশাপাশি শুয়ে পড়ল মাটিতে। এমনি সময় জঙ্গলের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল আর্মার্ড কার আর হাফ-ট্রাকগুলো। লাফিয়ে নামল জনা পঞ্চাশেক সৈন্য। রাইফেল, মেশিনগান আর বাজুকা নিয়ে উঠে আসতে আরম্ভ করল ওরা পাহাড়ের গা বেয়ে উপত্যকার দিকে।

'ওস্তাদ, আমার কারবার বারুদ নিয়ে। কোনও ব্রিজ উড়িয়ে দিলাম, কি কোনও রাস্তা ড্যামেজ করে দিলাম- কিংবা হয়তো একমুঠো বালু ছেড়ে দিয়ে এলাম শত্রুপক্ষের গাড়ির এঞ্জিন বিয়ারিং-এ। যুদ্ধের কৌশল বা স্ট্র্যাটেজি আমার সহজ সরল বুদ্ধি বিবেচনার বাইরের ব্যাপার। কিন্তু সেই আমার কাছেও মনে হচ্ছে ওই সৈন্যগুলো জেনে-শুনে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। কষ্ট করে আরেকটু ওপরে উঠে গুলি খাওয়ার চাইতে ওখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের বুকে গুলি করলেই তো পারে ব্যাটারা?'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে, মিশ্রী,' বলল রানা। চেয়ে দেখল কোনও কিছুর আড়ালে গিয়ে প্রাণ বাঁচাবার উপায় নেই ওদের, সোজা বুক পেতে দিয়ে উঠে আসছে ওপরে। 'আর সে কথা ওরাও জানে।'

'তাহলে আসছে কেন শালারা, ওস্তাদ?'

'এছাড়া আর কোনও উপায় নেই বলে। এই জায়গায় আসবার অন্য

কোনও পথ নেই সামনা-সামনি আক্রমণ করা ছাড়া। ভাল জায়গাই বেছে নিয়েছে, আরীফ। আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সূর্য ডুবে যাবে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামলে আমরা সরে যাব এখান থেকে। কিন্তু ওদের এই মরিয়া আক্রমণ দেখেই বুঝতে পারছি কি পরিমাণ ভয় পেয়েছে ওরা। আরও খানিকটা এগিয়ে নিক, আরীফ আর আমি মাঝখান থেকে আরম্ভ করব। আমি ডাইনে যেতে থাকব, আরীফ যাবে বাঁয়ে, আলতাফ আর মিশ্রী দুই ধার থেকে শুরু করে মাঝের দিকে আসতে থাকবে।'

'আমার বড় খারাপ লাগছে, ওস্তাদ,' বলল মিশ্রী খান।

'আমারই যে খুব আনন্দ হচ্ছে তা ভেব না। এটা যুদ্ধ তো নয়, নিছক হত্যাকাণ্ড। দ্বারোকা দুর্গের নিরাপদ আশ্রয়ে ডেস্কের পেছনে বসে হুকুম চালানো সহজ; তাই এদের বাধ্য করা হয়েছে মৃত্যু বরণ করতে। কিন্তু আমরা যদি ওদের বাধা না দিই তবে আমাদের কি অবস্থা হবে সেটাও ভেবে দেখো, মিশ্রী।'

'জানি, ওস্তাদ। এটাকে টারগেট প্র্যাকটিস মনে করবার চেষ্টা করব। কিন্তু এতগুলো ছাগল মারতেও আমার দুঃখ হত- আর এরা তো মানুষ।'

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল রানা।

'লাইট পোস্ট যে এত তাড়াতাড়ি সাইজ বদলাতে পারে তা আমার জানা ছিল না কিন্তু, মিশ্রী।'

সবাই হেসে উঠল। আসলে গোটা কয়েক ছয় ইঞ্চি মর্টার এনেছে ওরা সঙ্গে। সেগুলোর দিকে চেয়ে দেখল মিশ্রী একবার ভাল করে, তারপর বেহায়ার মত বলল, 'দূরবীন দিয়ে দেখেছিলাম কিনা; তাই বড় লেগেছিল। কিন্তু, ওস্তাদ, ভাতিজারা ফ্র্যাগমেন্টেশন বম্ব ব্যবহার করবে বলে মনে হচ্ছে। একটা টুকরো গায়ে লাগলেই হাওয়া হয়ে যাবে শরীরটা। কখন চালাবে ওগুলো?'

'আমরা ফায়ার করলেই আরম্ভ করবে।' বিনকিউলারটা চোখে লাগাতে যাচ্ছিল রানা, হঠাৎ হাতটা ধরে ফেলল আলতাফ। অবাক হয়ে চাইল রানা আলতাফের মুখের দিকে।

'ওটা আর ব্যবহার কোরো না, মেজর। অনেক চিন্তা করে দেখেছি আমি, খুব সম্ভব ওটার জন্যেই আমাদের অবস্থান জানতে পেরেছে ভারতীয়রা। তাই নির্ভুল ভাবে বিমান হামলা চালিয়েছে। সূর্যের আলো লেন্সগুলোয় প্রতিফলিত হয়েছিল...'

এতক্ষণে রানা বুঝল এই অতর্কিত বিমান হামলার কারণ। মাথা নাড়ল সে কয়েকবার। ভয়ানক রাগ হলো নিজের ওপর। একমাত্র ওর কাছেই ছিল বিনকিউলার- ও-ই ব্যবহার করেছিল সেটা চারদিকে নজর রাখবার কাজে। ও নিজেই কুমীর এনেছিল খাল কেটে। কিন্তু এখন আত্মগ্লানির সময় নেই। অনেক কাছে চলে এসেছে সৈন্যরা। খুব খারাপ লাগছে রানার- নিরুপায়

অসহায় লোকগুলোকে এভাবে হত্যা করতে হবে ভেবে বিতৃষ্ণায় ভরে উঠছে মনটা। কিন্তু স্থির অকম্পিত কণ্ঠে হুকুম দিল সে।

'ফায়ার!'

গর্জে উঠল চারটে মৃত্যুবর্ষী সাব-মেশিনগান। অসহায় সৈন্যগুলো থমকে গেল। কি ঘটছে ভাল করে বুঝবার আগেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল তিন চতুর্থাংশ সৈন্য। কেউ বা দুই হাত শূন্যে তুলে একপাক ঘুরে মাটিতে পড়ল মুখ থুবড়ে, গড়াতে গড়াতে নিচে চলে গেল কেউ কেউ, কয়েকজন মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুই তিন সেকেণ্ড, তারপর ঢলে পড়ল ঠিক পুতুলের মত। মাটিতে শুয়ে পড়ল অবশিষ্ট সৈন্যরা, গুলিবৃষ্টি থেকে একটু আড়াল খুঁজছে ওরা।

একসাথে থেমে গেল চারটে মেশিনগান। হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল চারপাশ। মিলিয়ে গেল ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। এই হঠাৎ নিস্তব্ধতা কয়েক সেকেণ্ডের বিকট শব্দের চাইতেও অনেক বেশি শব্দময় বলে মনে হলো। যেন গমগম করছে চারদিক। একটা কনুই সরিয়ে আলতাফের দিকে চাইল রানা। ভাবলেশহীন স্থির দৃষ্টি মেলে চেয়ে রয়েছে সে নিচের মৃতদেহগুলোর দিকে। ইশরাত? চোখ বন্ধ করে রেখেছে সে, পাছে ভয়ঙ্কর কিছু দেখতে হয়। হঠাৎ মিশ্রী খানের দিকে নজর পড়ল রানার। বিড় বিড় করে কি যেন বলছে সে।

'খোদা! শুধু একজন! আর একজন মাত্র। শুধু ওই হারামজাদাকে শেষ করবার সুযোগ দিয়ো- আর কিছু চাই না আমি!' বলছে মিশ্রী খান।

'কি ব্যাপার, মিশ্রী?' রানা কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল ওকে।

রানার দিকে লাল চোখ মেলে কট্‌মট্ করে চাইল মিশ্রী খান। যেন চিনতেই পারছে না। তারপর বার কয়েক চোখ মিটমিট করে মৃদু হাসল। গোঁফে একবার তা দিয়ে নিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'দিবা-স্বপ্ন দেখছিলাম, ওস্তাদ।'

'কাকে শেষ করতে চাইছিলে? যে পাষণ্ডটা এই বেচারাদের আমাদের পিছু ধাওয়া করতে বাধ্য করেছে, তাকে?'

হাসি মিলিয়ে গেল মিশ্রী খানের ঠোঁট থেকে। মাথা ঝাঁকাল সে। তারপর একটু এগিয়ে মাথা বাড়িয়ে নিচের দিকে দেখল সে। আবার হাসি ফুটল ওর মুখে।

'শালারা উটপাখির মত করছে, ওস্তাদ। মার্বেলের সমান পাথরের আড়ালে লুকাবার চেষ্টা করছে। ওদের মাফ করে দিই, কি বলেন, ওস্তাদ?'

'দাও, মাফই করে দাও।' রানা ভাবল, আর খুন খারাবি নয়। 'ওরা আর সাহস পাবে না এগোবার।' কথাটা বলেই ঝট্ করে মাথা নিচু করল রানা। কানের পাশ দিয়ে বোঁ করে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। পেছনের একটা পাথরে লেগে দূরে চলে গেল বিঙঙ্ আওয়াজ তুলে।

একটা স্প্যাণ্ডাও মেশিনগান থেকে গুলি আসছে মুষলধারে। কোনও

ট্রাকের পেছনে ফিট করা আছে খুব সম্ভব। ব্রীচের মধ্যে দিয়ে বেল্ট যাওয়ার শব্দও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে ওরা। আপন মনেই কথা বলে উঠল রানা।

'আপাতত মেশিনগানে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, আসল ভয় এখন ওই মর্টারগুলো।'

'ওগুলো তো চুপচাপ আছে,' বলল মিশ্রী খান।

'এখনও আছে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আর থাকবে না। ওই দেখো আবার আসছে প্লেনটা আমাদের খুঁজতে। আমাদের পজিশন জানাবে ওরা নিচের সৈন্যদের ওয়্যারলেসে।'

প্রায় ওদের মাথার ওপর এসে গেল প্লেনটা। দেখতে পেয়েছে ওদের। মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে। একটা পাথরের ফাঁকে চোখ দিয়ে নিচের দিকে চাইল মিশ্রী খান।

'ওস্তাদ!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল মিশ্রী। 'কামানগুলো আমাদের দিকে ফিরছে। এক্ষুণি কেটে পড়া দরকার!'

প্লেনটা মাথার ওপর থেকে সরল না। মর্টার ট্রাকগুলোর কাছে ওদের অবস্থান তো জানাচ্ছেই, অবশিষ্ট সৈন্যদেরও জানানো হয়েছে যে ওরা সরে গেছে অনেকখানি পশ্চিমে- নিরাপদে উঠে আসতে পারে তারা এখন। রানাদের আগের পজিশনে এসে গেছে ভারতীয় সৈন্য। ফ্র্যাগমেন্টেশন বম্ব পড়ছে ওদের কাছাকাছি। তাই মাঝে মাঝে ছোট ছোট গুহার মধ্যে আশ্রয় নিতে হচ্ছে ওদের। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারছে না। কারণ, ভারতীয় সৈন্য ক্রমেই এগিয়ে আসছে- দূরত্ব বজায় না রাখলে যদি কোনও সুযোগে একবার বেশি কাছে এসে পড়ে তাহলে গুহাতেই পচে মরতে হবে ওদের, বেরোতে পারবে না।

ছুটে এক গুহা থেকে অন্য গুহায় সরে যাচ্ছে ওরা ইশরাত জাহানের নির্দেশিত পথে। মাঝে মাঝে গুলি চালিয়ে হটিয়ে দিচ্ছে পেছনের সৈন্যদের। কিন্তু মর্টারের ঝুঁকিটা থেকেই যাচ্ছে সব সময়। খোলা জায়গায় কাছাকাছি একটা পড়লেই হয়েছে। একবার একটা বোমা ওদের গজ বিশেক সামনে এসে পড়ল। মাটিতে শুয়ে পড়ল সবাই। কিন্তু কপালগুণে ফাটল না সেটা। ভয়ে ভয়ে রোমাঞ্চিত শরীরে পা টিপে পার হয়ে গেল ওরা বোমাটার পাশ দিয়ে।

সূর্যাস্তের পর হঠাৎ পাহাড়ের একটা তীক্ষ্ণ কোণা ঘুরে দক্ষিণে চলে এল ওরা। ঢাকার নবাবপুর রোডের মত একটা অসমতল পথ পাওয়া গেল। দু'পাশে তার পাহাড়। মর্টার বন্ধ হয়ে গেছে। প্লেনটা এখনও আছে, কিন্তু বেকার চক্কর দিচ্ছে। সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে পাহাড়ের গভীর অঞ্চলে- রানাদেরকে আর দেখতে পাচ্ছে না পাইলট। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যগুলো বড় বেশি তৎপর হয়ে উঠেছে। ওদের প্রত্যেকের মনে জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন। অনেক এগিয়ে এসেছে ওরা। নিজের অপরিসীম ক্লান্তিবোধ থেকেই

অনুভব করতে পারল রানা দলের আর সবার কেমন লাগছে। আহার নেই, বিশ্রাম নেই, পুরোপুরি ঘুমও হয়নি কারও গত চারদিন। ভারতীয় সৈন্যরা ক্রমেই এগিয়ে আসছে আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে।

রাস্তার তীক্ষ্ণ বাঁকটার কাছেই একটা পাথরের ওপর চড়ে বসল রানা। ওখান থেকে ভারতীয় সৈন্যদের কার্যকলাপের ওপর চোখ রাখা যাবে- সেই সাথে বিশ্রামও পাবে একটু দেহটা। সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে পড়ল মাটিতে।

আনমনে দেখছে রানা নিজের ছোট্ট দলটাকে, আর মনে মনে হিসেব কষছে, কি পরিমাণ সম্ভাবনা আছে ওদের টিকে থাকার। খুব ভরসা পেল না সে। নাজির বেগ রীতিমত গুরুতর জখম হয়েছে। ইশরাত জাহান তার সাধ্যের অতীত পরিশ্রম করেছে- মুখ দিয়ে ফেনা উঠতেই কেবল বাকি। আর তেমনি সজাগ সচেতন আছে মাহবুব, কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে অতি দ্রুত। মিশ্রী খান মাটিতে শুয়ে পড়ে গোঁফে তা দিচ্ছে আর পরম তৃপ্তির সঙ্গে বক সিগারেট টানছে একটা। রানারই মত ক্লান্ত হয়েছে, কিন্তু রানারই মত আরও বহুক্ষণ ধরে ক্লান্ত হতে পারবে সে। আর দুর্ধর্ষ আলতাফ যেমন ছিল তেমনি আছে- অক্লান্ত, অদম্য, অটল।

চারপাশে আর একবার চোখ বোলাল রানা। নীল সমুদ্র দেখা যাচ্ছে দূরে। লাইট হাউসের উজ্জ্বল আলো চোখে পড়ল। ওপাশে দ্বারোকা বন্দরেও একটা দুটো করে জ্বলে উঠছে সন্ধ্যা-বাতি।

হঠাৎ দেহের সমস্ত পেশী শক্ত হয়ে গেল রানার। দক্ষিণ দিকে চোখ পড়তেই দেখা গেল ছয়শো গজ দূরে শেষ হয়ে গেছে রাস্তাটা, সামান্য উঁচু পাহাড়। এক লাফে উঠে দাঁড়াল রানা।

'আরীফ? কোথায় নিয়ে এসেছ আমাদের? জায়গাটা চেনো তো তুমি ভাল মত?'

'নিশ্চয়ই, মেজর। এই পাহাড়ের সব কিছু আমার নখ-দর্পণে।'

'কিন্তু এই রাস্তা তো ওখানে গিয়েই শেষ হয়ে গেছে। ফাঁদের মধ্যে চলে এসেছি আমরা। এখন কুকুরের মত গুলি খেয়ে মরতে হবে ওদের হাতে।'

'না, মেজর। হাতের বাঁয়ে একটা গুহা আছে। সেই পথে আমরা এই পাহাড় থেকে বেরিয়ে আরেকটা উপত্যকায় চলে যাব। তার পাশেই দ্বারোকা যাবার পাকা সড়ক- মাইল খানেক গেলেই দ্বারোকা দুর্গ। কিন্তু আমরা আধ মাইল গিয়েই নিরাপদ আশ্রয়ে লুকিয়ে পড়ব আজকের রাতটার জন্যে।'

শান্ত হলো উদ্বিগ্ন রানা। মিশ্রী খানও কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে শুনছিল কথাগুলো, এবার সটান শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে।

'গুহাটা ঠিক খুঁজে পাবে তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'চোখ বেঁধে দিলেও।' দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ইশরাত জাহানের কণ্ঠে।

'আচ্ছা, বেশ...' কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু কথা থামিয়ে হঠাৎ

পাথরের ওপর থেকে লাফ দিল সে। মাহবুবের ওপর পড়তে যাচ্ছিল, শূন্যে থাকতেই শরীরটা বাঁকিয়ে মিশ্রী খান আর আলতাফ ব্রোহীর মাঝখানে পড়ে দেয়ালের গায়ে জোরে ধাক্কা খেলো সে। উঠে এসেছে ভারতীয় সৈন্য-দেড়শো গজ দূরে একটা বাঁকের কাছে এসেই রানাকে দেখতে পেয়ে গুলি ছুঁড়েছে। আর একটু হলেই সাঙ্গ হয়ে যেত রানার ভবলীলা। গুলিটা বাম কাঁধের কাপড় ছিঁড়ে খানিকটা চামড়া চিরে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে ধরল রানাকে মিশ্রী খান। বিনা বাক্য ব্যয়ে শার্টের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করল জখমের পরিমাণ।

'অসাবধান থাকার এই ফল,' বলল রানা। 'কিন্তু আমি ভাবতেও পারিনি এত কাছে চলে এসেছে ওরা।'

'ওস্তাদ, জখম তো খুঁজে পাচ্ছি না। কোথায় লেগেছে?'

'ব্যাটাদের হাতের সই নেই। ছুঁয়ে গেছে কেবল, লাগাতে পারেনি।' সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। 'কিন্তু এক্ষুণি রওনা হওয়া দরকার। কতদূর আছে গুহার মুখটা, আরীফ?'

হঠাৎ মুখে কথা জোগাল না ইশরাত জাহানের। রানার দিকে অপরাধীর মত একবার চেয়েই চোখ নামাল সে মাটির দিকে।

'আরীফ!' ডাকল রানা।

'গুহাটা বেশ দূরে, মেজর। আসলে ওটা এই পাথুরে রাস্তার শেষ মাথায়।'

'একেবারে শেষ মাথায়?' চোখ কপালে উঠল রানার।

মাথা নাড়ল আরীফ মাটির দিকে চেয়ে।

'বাহ্! চমৎকার! এতক্ষণে বলছ সে কথা?' খেঁকিয়ে উঠল রানা।

'আমি...আমি, মানে...'

'থাক থাক, হয়েছে। এখন চুপ করো।' মাটিতে বসে পড়ল রানা। এখন উপায়? আলতাফ ওর ব্রেনগানটা পাথরের ফাঁকে রেখে কয়েক রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করল শত্রুপক্ষের ওপর। কোন কিছু লক্ষ্য করে নয়- শত্রুপক্ষকে কেবল এটুকু জানিয়ে দেবার জন্যে যে আর এগোলে ভাল হবে না।

নিঃশব্দে পার হয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ড। মৃদুকণ্ঠে কথা বলে উঠল ইশরাত জাহান, 'আমি, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মেজর। ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে। আমি মনে করছিলাম ওরা এখনও অনেক পেছনে আছে।'

'এটা তোমার কোনও ভুল নয়, আরীফ।' ইশরাতের কাঁধের ওপর একটা হাত রাখল রানা। 'দোষটা তোমার নয়। আমিও তাই মনে করেছিলাম। নিজেকে অপরাধী ভাবার কোন দরকার নেই। তাছাড়া যা হবার...'

'স্যার!' রানার জামার আস্তীন ধরে টান দিল মাহবুব। 'কি হয়েছে? কিচ্ছু বুঝতে পারছি না আমি।'

'খুবই সহজ ব্যাপার, মাহবুব। এই সোজা পথ ধরে ঝাড়া আধমাইল যেতে হবে এখন আমাদের। কোথাও এতটুকু আড়াল নেই। অথচ শ' দেড়েক গজ এগোলেই ভারতীয় সৈন্যরা পৌঁছে যাবে এখানে। আর এখানে পৌঁছানো মানেই ওদের যেমন অসহায় অবস্থায় ফেলে গুলি চালিয়েছিলাম আমরা, ঠিক তেমনি অনায়াসে খুন করবে ওরা আমাদের।' আলতাফ আরও কয়েক রাউণ্ড গুলি চালাল। শব্দটা থামতেই আবার আরম্ভ করল রানা। 'ওরা এগোবার চেষ্টা করছে। এককেবার খানিকটা এগিয়ে দেখছে আমরা এখনও এই কোণটা দখল করে বসে আছি কিনা। যে-মুহূর্তে ওরা বুঝবে যে, আমরা আর এখানে নেই, সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎগতিতে এসে উপস্থিত হবে। আমরা অর্ধেক রাস্তা পার হবার আগেই ওরা পৌঁছে যাবে এখানে। কুকুরের মত গুলি করে খুন করবে আমাদের সবাইকে।'

'কিন্তু, স্যার, একজনকে পেছনে গার্ড রেখে...'

'তারপর গার্ডটার কি হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা ওকে বাধা দিয়ে।

'ওহ্-হো। বুঝলাম এখন। একথা তো চিন্তা করিনি।'

'তুমি করোনি। কিন্তু যাকেই পেছনে গার্ড হিসাবে রেখে যেতে চাইব সে প্রথমে এই কথাটাই চিন্তা করবে।'

'আমার মনে হয় এ নিয়ে বৃথা সময় নষ্ট না করাই ভাল,' হঠাৎ কথা বলে উঠল ইশরাত জাহান। 'দোষ আমার। আমার জন্যেই দলের সবার এই অবস্থা হলো। আমিই...'

'শাব্বাশ, ভাতিজা!' প্রকাণ্ড এক চাপড় বসাল মিশ্রী খান ইশরাতের কাঁধে। 'কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বীরত্ব প্রদর্শনের সুযোগ পাবে না। ওস্তাদ তো বলেইছে দোষ তোমার নয়।' এক ঝটকায় ইশরাতের সাব-মেশিনগানটা কেড়ে নিয়ে মাটিতে নামিয়ে রাখল মিশ্রী খান। রানা বুঝল মিশ্রীর ব্যবহারটা কেমন যেন বদলে গেছে। কি যেন চিন্তা করছে গভীর মনোযোগের সাথে। তাই তার ব্যবহার কথাবার্তা অসংলগ্ন।

নাজির বেগ বলল, 'রাত্রির অন্ধকার না নামা পর্যন্ত তো আমরা এখানেই অপেক্ষা করতে পারি। তারপর অন্ধকারের মধ্যে...'

'ভুলে যাচ্ছ একটা কথা, নাজির। আজ পূর্ণিমা। আকাশে ছিটে ফোঁটা মেঘও দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া আজ সন্ধ্যার পরপরই যদি শহরে পৌঁছতে না পারি তাহলে কোনও দিনই আর পারব না পৌঁছতে। আজই আমাদের শেষ সুযোগ।'

এক মিনিট কেউ কোও কথা বলল না। তারপর হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে কথা বলে উঠল মাহবুব চানন্।

'ঠিকই বলেছে, আরীফ,' দুর্বল কণ্ঠে বলল সে। কিন্তু ওর কণ্ঠস্বরে এমন একটা আশ্চর্য দৃঢ়তা প্রকাশ পেল যে প্রত্যেকে ওর দিকে ফিরে চাইতে বাধ্য হলো। আরীফের সাব-মেশিনগানটা এখন ওর হাতে। বাম কনুইয়ে ভর

করে মাথাটা রেখেছে সে হাতের ওপর। 'সমস্যাটা অত্যন্ত সহজ, এবং এর সমাধানও খুবই সরল। গ্যাংগ্রিনটা আমার সারা পা ছেয়ে ফেলেছে, তাই না, মেজর?'

থতমত খেয়ে গেল রানা। কি বলবে বুঝে উঠতে পারল না। এত আকস্মিক ভাবে এমন মারাত্মক প্রশ্ন করে বসবে মাহবুব ভাবতেও পারেনি সে। কেন কথাটা জিজ্ঞেস করছে সে, বুঝতে অসুবিধে হলো না ওর। চেয়ে দেখল রানা, মিশ্রী খানের দুই চোখে নিষেধ- সত্যি কথাটা বলতে বারণ করছে সে।

'সত্যি করে বলুন, স্যার। হ্যাঁ, কি না?' স্থির নিষ্কম্প মাহবুবের গলা। হঠাৎ রানা পেয়ে গেল সঠিক উত্তরটা। এছাড়া আর উপায়ই বা কি?

'হ্যাঁ।' রানা দেখল ভীত, বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে মিশ্রী খানের চোখ।

'ধন্যবাদ,' মাহবুবের কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা। 'আমি জানতাম। কাজেই আমি থাকছি এখানে। এই দুঃসাহসী গ্রুপের মেম্বার হিসেবে আমারও একটা ভূমিকা আছে। আমার কর্তব্যটুকু আমি সম্পাদন করব। করুণ বিদায় সম্ভাষণের কোনও প্রয়োজন নেই। কয়েক বাক্স গুলি আর গোটা দুই-তিন হ্যাণ্ড গ্রেনেড রেখে চলে যান আপনারা।'

'খোদার কসম বলছি, মাহবুব…' দুই পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল মিশ্রী খান। মাহবুবের হাতের মেশিনগানটা সোজা ওর বুকের দিকে ধরা।

'আর এক পা সামনে এগোলেই গুলি করব, ক্যাপ্টেন!'

অনেকক্ষণ চেয়ে রইল মিশ্রী খান মাহবুবের নিষ্পলক চোখের দিকে। তারপর পিছিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

'আচ্ছা, খোদা হাফেজ। আমার জন্যে অনেক কষ্ট ভোগ করেছেন আপনারা- সেজন্যে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানবেন। যান, রওনা হয়ে যান।'

পুরো এক মিনিট পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল সবাই। তারপর কাছে এগিয়ে এল মিশ্রী খান। ছেঁড়া, নোংরা জামা গায়ে, সন্ধ্যার আধো আলো আধো ছায়ায় বিকট দেখাল মিশ্রী খানের হাWিডসার দেহটা। নিচু হয়ে মাহবুবের একটা হাত ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দিল সে।

'শাব্বাশ, ভাতিজা!' হাসবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু কান্নার মত দেখাল হাসিটা। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কি ভেবে বলল না। 'আচ্ছা, চলি, মাহবুব। আবার দেখা হবে।' কোনও মতে দ্রুত কথাটা বলেই উঠে দাঁড়াল সে। হঠাৎ ঘুরে হাঁটতে আরম্ভ করল। নাজির বেগ আর ইশরাত জাহান নিঃশব্দে চলে গেল ওর পেছন পেছন। আলতাফ কি যেন বলল মাহবুবের কানে কানে। মৃদু হেসে মাথা নেড়ে ওর কথাটা যেন সমর্থন করল মাহবুব। তারপর একা দাঁড়িয়ে রইল রানা। মনের মধ্যে ঝড় বইছে ওর। ওর দিকে চেয়ে ম্লান হাসল মাহবুব।

'অনেক ধন্যবাদ, স্যার। মিথ্যে কথায় না ভুলিয়ে আপনি আমাকে সম্মানিত করেছেন।'

'তোমার… তোমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না তো, মাহবুব?' রানা ভাবল, ছি আর কোনও কথা কি পেল না সে খুঁজে?

'না, স্যার। সত্যি বলছি, কিচ্ছু কষ্ট হচ্ছে না আমার। কোনও ব্যথাই অনুভব করতে পারছি না। চমৎকার আছি।'

'তোমার জন্যে আমি গর্বিত, মাহবুব।' কেন যেন কেঁপে গেল রানার গলার স্বর।

'আপনার এখন রওনা হওয়া উচিত, স্যার। আর সবাই অপেক্ষা করবে আপনার জন্যে। তার আগেই ওই পাথরটার আড়াল থেকে নিচের দিকে গোটা কতক এলোপাতাড়ি গুলি করে দিলে ভাল হয়।'

কয়েক রাউণ্ড গুলি চালিয়ে এসে দাঁড়াল রানা মাহবুবের পাশে।

'কোনও কিছু লাগবে তোমার, মাহবুব?'

'না, স্যার। হ্যাঁ। একটা সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে যান। আর…আর, যদি সম্ভব হয়, আমার মায়ের সাথে দেখা করে বলবেন, আমি কষ্ট পেয়ে মরিনি।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দলের আর সবাইকে ধরে ফেলল রানা। আর পনেরো মিনিটেই পৌঁছে গেল ওরা গুহা মুখে। চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কান পেতে শুনল ওরা, অবিরাম গুলি চালাচ্ছে মাহবুব। ওর প্রাণের বিনিময়ে দলটা পেল এগিয়ে যাবার ছাড়পত্র। এই মহান আত্মত্যাগকে বিফল হতে দিতে পারে না ওরা।

বারো

আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেল ওরা দ্বারোকায়। দুর্গ-তোরণের পঁচিশ গজের মধ্যে।

ব্যাপারটা বিশ্বাস করতেই ভরসা পেল না রানা। সত্যিই তাহলে এত বাধা বিপত্তির পর পৌঁছেচে ওরা গন্তব্যস্থলে? এটা কি তাহলে সত্যিই একেবারে অসম্ভব ছিল না? তাহলে কি বাকি কাজটুকুও সম্ভব?

গুহামুখে ঢোকার পরেই সবকিছু এত সহজ এবং স্বচ্ছন্দে ঘটে গেল যে

অবিশ্বাসের ঘোরটা কিছুতেই কাটতে চাইছে না রানার। দোতলা বাড়ির জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চাইলেই দেখা যাচ্ছে দুর্গ-তোরণ। উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে সেখানে।

গুহার মধ্যে ঢোকার পরই নাজির বেগ পড়ে গিয়েছিল মাটিতে। জখম পায়ে বহুক্ষণ দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিকূল অবস্থার সাথে যুদ্ধ করেছে সে, আর পারল না। সেখানেই রয়ে যেতে চেয়েছিল সে। মাহবুবকে হত্যা করে সৈন্যরা এগিয়ে এলে ঠেকাতে পারবে সে। কিন্তু রাজি হয়নি রানা। কঠোর ভাবে বকা দিয়েছে ওকে। বুঝিয়ে কথা বলবার সময় ছিল না তখন। আপত্তি করবার সাহস পায়নি নাজির বেগ। আলতাফ আর মিশ্রী খানের সাহায্যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোতেই হয়েছে ওকে ওদের সঙ্গে। রানা বুঝল, আর কিছু নয়, ছুতো খুঁজছে সে আরও কিছু ভারতীয় সৈন্যকে হত্যা করবার। প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে ওর মনের মধ্যে সর্বক্ষণ।

গুহা থেকে বেরিয়ে রাস্তার কাছাকাছি এসেই ঠোঁটে আঙুল রেখে সবাইকে চুপ করবার ইঙ্গিত করল ইশরাত। রানাও শুনতে পেল কয়েকজন লোকের কথাবার্তা। কয়েকটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে কারা যেন কথা বলছে। হাত তুলে থামতে বলল রানা দলের সবাইকে। কিন্তু ঠক্ করে একটা শব্দ এল কানে- অস্ফুট একটা গোঙানির শব্দও পেল সে। রেগে গেল রানা। পেছনে ফিরে এল সে কারণ অনুসন্ধান করবার জন্যে। দেখল মাটিতে পড়ে আছে নাজির বেগের জ্ঞানহীন দেহ। মিশ্রী খান বলল যে এত হঠাৎ থামতে বলায় ও টাল সামলাতে না পেরে ধাক্কা খেয়েছে নাজির বেগের সাথে, হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে গেছে তাই নাজির বেগ, এবং মাথাটা একটা পাথরের ওপর পড়ায় জ্ঞান হারিয়েছে। অজ্ঞান হওয়ার ভান করছে কিনা পরীক্ষা করে দেখল রানা নিচু হয়ে। হত্যার নেশা ওর রক্তে। ছুতো ধরে পিছিয়ে পড়বার চেষ্টা করতে পারে হয়তো। কিন্তু না। মাথার পেছনে ফোলা জায়গাটা দেখেই বুঝল রানা সত্যিই জ্ঞান হারিয়েছে সে।

দশজন ভারতীয় সেপাই হেঁটে চলে গেল গল্প করতে করতে। রানাদের উপস্থিতি টের পায়নি ওরা। ইশরাত বলল এদিক থেকে যাতে ওরা বেরোতে না পারে খুব সম্ভব সেজন্যে পাঠানো হয়েছে ওদের। দ্বারোকার ব্রিগেডিয়ার ওদের সমস্ত সম্ভাব্য পথ বন্ধ করবার ব্যবস্থা করেছে। রানার কাছে কথাটা তেমন যুক্তিযুক্ত মনে হলো না। কিন্তু তর্ক না করে এগিয়ে গেল সে সামনে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই রাস্তার ওপর দাঁড়ানো ট্রাক দেখতে পেল ওরা। দু'জন গার্ডের হাত-পা বেঁধে ঝোপের আড়ালে ফেলে দিতে লাগল আরও এক মিনিট, তারপর ছুটল ট্রাক চওড়া রাস্তা ধরে।

পথে কোন বাধা পায়নি ওরা। মিলিটারি ট্রাকটা পেয়ে ভালই হয়েছে। রাত সাড়ে আটটা থেকে কারফিউ ঘোষণা করা হয়েছে দ্বারোকায়। সাড়ে আটটার অবশ্য দেরি আছে অনেক, তবু পায়ে হেঁটে এগোলে ধরা পড়বার

সম্ভাবনা ছিল। ইশরাত বসেছে ড্রাইভিং সীটে, হেড লাইট অন করে দক্ষ হাতে চালিয়ে এসেছে সে এই মাইলখানেক রাস্তা। ছোট্ট শহর দ্বারোকা। সব কিছু ইশরাতের মুখস্থ। অনেকগুলো গলি-ঘুঁচি পেরিয়ে প্রায়-নির্জন একটা রাস্তা ধরে এগিয়ে এসে থেমেছে ওরা দোতলা এই বাড়িটার সামনে। লেফটেন্যান্ট আরীফের গোপন আস্তানা। নাজির বেগ টলতে টলতে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে ওদের দোতলায়। ইশরাত চলে গেছে ট্রাকটার একটা সুব্যবস্থা করতে।

রানা ভাবল ইশরাতের কোনও বিপদ না হলেই হয়। দ্বারোকা পৌঁছে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে সে। সবই তার চেনা। রানাদের গাইড করবার ভার এখন ওর। ওকে ছাড়া এখন রানারা অন্ধের মত। তাই নিজের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠেছে সে দ্বারোকা পৌঁছেই। ট্রাকটাকে নিয়ে কি করতে যাচ্ছে তা-ও রানাকে জানাবার প্রয়োজন বোধ করেনি সে। ডাঙায় তোলা মাছকে আবার পানিতে ছেড়ে দিলে তার যেমন অবস্থা হয়, তেমনি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছে ইশরাত দ্বারোকা পৌঁছে।

রানা ভাবছে ইশরাতের কথা। ওর জন্যে উদ্বেগ অনুভব করল সে। ওকে ছাড়া চলবে না, বা ওর সাহায্যের এখন খুব প্রয়োজন, সেজন্যে নয়। কেন জানি এক অদ্ভুত আকর্ষণ বোধ করছে রানা ওর প্রতি। মেয়ে বলে নয়, প্রথম দর্শনেই এই মিষ্টভাষী, সদা চঞ্চল, উৎসাহী মানুষটা ওর মনের মধ্যে একটা বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। নাজিরের জন্যে সে ভাবটা হয়নি। কোথায় যেন ইশরাতের সঙ্গে তার মস্ত তফাৎ আছে। দোষটা অবশ্য নাজিরের নয়- অবস্থার চাপে পড়ে সে ওরকম হয়েছে। ইশরাতের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণচাঞ্চল্য ক'জনের মধ্যেই বা আছে? ইশরাতের উপস্থিত বুদ্ধিরও তুলনা হয় না। দুটো আস্তানা আছে ওর দ্বারোকায়। ইচ্ছে করেই সে দুর্গের একেবারে গায়ে লাগানো একটা বাড়িতে এনে তুলেছে ওদের, ভারতীয় সৈন্যদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন হবে যে দুর্গের এত কাছে এসে উঠতে পারে ওদের কম্যাণ্ডো গ্রুপ। অথচ এখান থেকে দুর্গরক্ষীদের গতিবিধি অনায়াসে লক্ষ করতে পারবে ওরা।

বহুদিনের পুরানো বাড়ি। দেয়ালের চুন-সুরকি খসে লাল ইঁট দেখা যাচ্ছে জায়গায় জায়গায়। দোতলায় মস্ত একটা খালি ঘর। আলো জ্বালাবার উপায় নেই, জানালা দিয়ে যেটুকু বাইরের আলো আসছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে ওদের।

নাজির বেগের সাহায্যে একতলায় ভাঁড়ার ঘর খুঁজে বের করে চিঁড়ে গুড় আর খাবার পানি জোগাড় করে নিয়ে এল মিশ্রী খান। পাশের বাড়ি থেকে এক ছড়া কলা চুরি করে নিয়ে এল নাজির বেগ পায়ের ভয়ানক জখম সত্ত্বেও।

একরাত একদিন পর এই সাধারণ খাদ্যদ্রব্যগুলোর মধ্যেই অসাধারণত্ব

আবিষ্কার করে পরম বিস্ময় প্রকাশ করল সবাই। মাটির কলসের ঠাণ্ডা পানিতে অমৃতের স্বাদ পেল ওরা।

সটান মেঝেতে শুয়ে পড়ল মিশ্রী খান। বক সিগারেট ধরাল একটা। এই প্রথম স্পষ্ট এবং বিস্তারিত ভাবে ভেঙে বলল রানা সবাইকে দ্বারোকার দুর্গম দুর্গে প্রবেশের প্ল্যানটা। গলার স্বর খাটো করবার দরকার হলো না- রাস্তার ঠিক অপর পাশের বাড়িটায় ঘটাং ঘট্ খটাং খট্ মেশিন চলছে। একটা ডিমাই ফ্ল্যাট বেড আর একটা হাফ-ক্রাউন ট্রেডল্ প্রিন্টিং মেশিন যেন পাল্লা দিচ্ছে একে অপরের সঙ্গে- কেহ কারে নাহি পারে সমানে সমান। ধীরে সুস্থে প্রত্যেককে বুঝিয়ে দিল রানা প্ল্যানটা, কাজ ভাগ করে দিল প্রত্যেকের মধ্যে, জিজ্ঞেস করে করে জেনে নিল সবাই সব কথা ঠিক মত বুঝেছে কিনা।

'এইবার খানিক বিশ্রাম নিয়ে নেয়া যাক। এই আমাদের শেষ সুযোগ। আরীফ না আসা পর্যন্ত যে যত পারো গড়িয়ে নাও। আমি পাহারায় থাকলাম,' বলল রানা।

'আমি পাহারায় থাকব,' তড়াক করে উঠে বসল মিশ্রী খান।

'তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, মিশ্রী...'

'আপনার নিজের চেহারা নিজে দেখতে পাচ্ছেন না বলে এই কথা বলছেন, ওস্তাদ। দয়া করে কথা না বাড়িয়ে শুয়ে পড় ন ভালয় ভালয়, নইলে এই খোকাটা (আলতাফকে দেখিয়ে) জোর করে শোয়াবে। না, ওস্তাদ, নিজের ওপর এভাবে অত্যাচার করবার কোনও অধিকার নেই আপনার।'

রানা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, আলতাফ বলল, 'ঠিকই বলেছে মিশ্রী খান, আমাকে কি সত্যিই উঠতে হবে, মেজর?'

হেসে ফেলল রানা। পরাজয় স্বীকার করে নিল। মেঝের ওপর পিঠ ঠেকিয়েই উপলব্ধি করল সত্যি সত্যিই কতখানি পরিশ্রান্ত হয়েছে সে। ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে ঘুমে জড়িয়ে আসতে চাইল ওর চোখ। সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তলটা নিয়ে উঠে গেল মিশ্রী খান জানালার পাশে। তিন মিনিটের মধ্যেই মিশ্রী খান ছাড়া আর সবাই ঘুমিয়ে পড়ল গভীর ঘুমে।

কিন্তু কপালে যাদের বিশ্রাম নেই তারা শুধু শুধু বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করলে পাবে কেন? পঁচিশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল ইশরাত জাহান। দরজায় মৃদু টোকা পড়তেই রানার ঘুম ভেঙে গেল। পিস্তল হাতে সন্তর্পণে এগোচ্ছিল মিশ্রী খান, রানাকে উঠে বসতে দেখে বলল, 'দরজায় কে যেন টোকা দিল, ওস্তাদ।'

'খুব সম্ভব আরীফ। আমি দরজা খুলব নিচে গিয়ে, তুমি আড়ালে লুকিয়ে থাকবে প্রস্তুত হয়ে।'

হাঁপাচ্ছে ইশরাত জাহান। ঢক ঢক করে প্রথমেই এক গ্লাস পানি খেলো সে।

'বেঁচে আছ তাহলে এখনও, ছোকরা?' মিশ্রী খানের কণ্ঠস্বরে স্নেহ ঝরে

পড়ল। 'ব্যাপার কি, হাঁপাচ্ছ কেন? তাড়া করেছিল কেউ?'

'কে তাড়া করবে? আমার ছায়াও তো দেখতে পায়নি কেউ। মনে করলাম আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে থাকবেন আপনারা, তাই সারাটা পথ দৌড়ে চলে এসেছি।'

'কোথা থেকে সারা পথ দৌড়ে এসেছ, আরীফ?' জিজ্ঞেস করল আলতাফ। জেগে গেছে সে-ও।

'সোমনাথের মন্দির থেকে। ডান দিকের রাস্তা ধরে দেড় মাইল দক্ষিণে। জঙ্গলের মধ্যে বহুকালের পুরানো ভাঙা একটা মন্দির। সাপের দৌরাত্ম্যে কেউ আর ঘেঁষে না ওইদিকে।'

'ওখানে গিয়েছিলে কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'চিন্তা করে দেখলাম, গুহামুখে আমাদের জন্যে যে-সব সৈন্যরা অপেক্ষা করছে, ওরা যখনই টের পাবে যে ট্রাকটা খোয়া গেছে অমনি বুঝে ফেলবে যে কাজটা আমাদের। ঝোপের ধারের হাত-পা বাঁধা লোকগুলোও সেই সাক্ষ্যই দেবে। ওরা পরিষ্কার জেনে যাবে যে আমরা আর ওখানে নেই, চলে এসেছি শহরের দিকে।'

একটু থেমে সবার দিকে চাইল আরীফ। রানা বলল, 'তা জেনে যাবে। তারপর?'

'তারপর সমস্ত দ্বারোকার প্রতিটা বাড়ি সার্চ করে খুঁজবে আমাদের। দ্বারোকায় না পেলে শহরের আশেপাশে খুঁজতে আরম্ভ করবে হন্যে হয়ে। কিন্তু আগে খুঁজবে দ্বারোকায়। বাতাসের গন্ধ শুঁকেই বুঝলাম বৃষ্টি আসছে। অল্পক্ষণেই মেঘে ঢেকে যাবে চাঁদ।'

'তাড়াতাড়ি কথা শেষ করো, আরীফ- তোমার সাত-কাণ্ড রামায়ণ শুনবার সময় নেই,' রানা বলল নীরস কণ্ঠে।

আহত হলো ইশরাত। বলল, 'কথা প্রায় শেষ। যাতে প্রথমেই শহরে সার্চ না ক'রে গ্রামের দিকে সার্চ করে তার ব্যবস্থা করে দিয়ে এসেছি।'

'কি করে?' অবাক হলো রানা।

'সে অনেক কথা, শুনবার সময় হবে কি?'

হেসে ফেলল রানা। বুঝল রাগ করেছে ইশরাত। ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'আমাদের অবস্থা তো বুঝতেই পারছ, ইশ...আরীফ। সব কথা জানা-ও চাই, আবার সংক্ষেপ হওয়াও চাই। এখন প্রতিটা মুহূর্ত মূল্যবান। যে-কোন মুহূর্তে আমাদের সমস্ত প্ল্যান বদলাতে হতে পারে। কাজেই মান অভিমান...'

'না। মান-অভিমানের কিছুই নেই। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন, সব কথা সংক্ষেপে হয় না। সংক্ষেপে বললে সেটাকে আবার ব্যাখ্যা করতে হয়। যাক, যা বলছিলাম, আমি ভেবে দেখলাম, ওদের মনোযোগ যদি শহর থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারি তাহলে ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে অন্তত আমরা নিশ্চিন্তে

থাকতে পারব। তাই ট্রাকটা সোমনাথের মন্দির প্রাঙ্গণে নিয়ে গিয়ে ওটার ট্যাঙ্ক থেকে সমস্ত পেট্রল বের করে সারাটা গাড়ি আচ্ছামত ভেজালাম। তারপর আগুন ধরিয়ে দিলাম ওতে।'

'আগুন ধরিয়ে দিয়েছ! কেন?' আলতাফ জিজ্ঞেস করল।

'কারণটা খুবই সহজ। উপত্যকার সৈন্যরা এতক্ষণে টের পেয়ে গেছে যে ট্রাকটা চুরি করেছি আমরা। আগুন দেখতে পাবে ওরা ওখান থেকে। সাথে সাথেই ছুটবে সোমনাথের মন্দিরের দিকে। আগুন না নেভা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। তারপর ট্রাকের মধ্যে মৃতদেহ বা হাড়গোড় কিছু না পেয়ে মন্দিরটা খুঁজবে তন্ন তন্ন করে। সেখানেও যখন কিছু পাবে না তখন আশেপাশের গ্রামগুলোতে খুঁজবে। সেখানেও নেই আমরা। তখন ওরা বুঝতে পারবে যে বোকা বানিয়েছি আমরা ওদের- আসলে শহরের মধ্যেই কোথাও আছি। শহরের দিকে তখন আসবে ওরা ধেয়ে, একটি বাড়িও বাদ দেবে না, এবং সারা শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজে কি দেখবে ওরা? দেখবে, এখানেও নেই আমরা।'

'ততক্ষণে খোদার কাছে চলে গেছি?' টিটকারি মেরে বলল মিশ্রী খান।

'না। সশরীরে বেঁচে আছি। বৃষ্টি নামবে অল্পক্ষণেই, মেঘে ঢেকে যাবে চাঁদ। এই অন্ধকারের মধ্যে বেমালুম গায়েব হয়ে যাব আমরা। টিএনটি লুকিয়ে রেখে আমরা সরে যাব এখান থেকে।'

'কোথায়?' চমৎকৃত রানা জিজ্ঞেস করল।

'কোথায় আবার? সোমনাথের মন্দিরে। কাল সকালের আগে ওরা কিছুতেই ওখানে আবার খোঁজ করবে না। নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারব আমরা সেখানে।'

সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা ইশরাতের দিকে। তারপর বলল, 'এই কম্যাণ্ডো গ্রুপের নেতৃত্বের ভার তোমার ওপর না দিয়ে আমাকে দেয়া ভুল হয়ে গেছে কমোডোরের। চমৎকার প্ল্যান হয়েছে, আরীফ। জয়ের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার।'

তীরের মত চোখে মুখে এসে বিঁধছে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা। মাথাটা এক ঝাঁকুনি দিয়ে চোখের ওপর এসে পড়া একগুচ্ছ ভেজা চুল সরিয়ে দিল রানা। বাম হাতটা তুলে চোখ আড়াল করল। ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে সর্বাঙ্গ। দশ বারো ফুট উঁচুতে দুর্গ-প্রাচীরের মাথা।

'মরে যাব, ওস্তাদ! এইটা ডিঙাতে হলে ঠিক মরে যাব। দেয়ালের সারা গায়ে কাঁচের টুকরো বসানো,' কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে বলল মিশ্রী খান।

গায়ে-গায়ে লেগে থাকা বাড়িগুলোর ছাত ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে দেয়ালের সবচেয়ে কাছের বাড়িটার ছাতে এসে উপস্থিত হয়েছে রানা আর মিশ্রী খান। দুর্গ রক্ষার স্বার্থে কোনও বাড়িকেই দোতলার বেশি বাড়তে দেয়া হয়নি,

প্রত্যেকটা বাড়িই দোতলা পর্যন্ত এসে ঠেকে গেছে। তাই কোন অসুবিধেই হয়নি ওদের এখানে পৌঁছতে। কিন্তু দেয়াল দেখেই দমে গেল মিশ্রী খান।

'কিচ্ছু ভয় নেই, মিশ্রী। দেয়াল টপকাতে হবে না আমাদের। কাজের সুবিধার জন্যে এক্সপ্লোসিভের বাক্সদুটো শুধু দেয়ালের ওপর লুকিয়ে রাখব। ভয় নেই, আমিই যাব। তুমি বাক্সদুটো আমার পিঠে বাঁধবার আগে একবার ভাল করে চেক করে নাও, আমি হুকটা ততক্ষণে বাধিয়ে ফেলছি দেয়ালের মাথায়।'

কিছুটা আশ্বস্ত হলো মিশ্রী খান। বলল, 'কিন্তু, ওস্তাদ, দেয়ালটা কম হলেও পনেরো ফুট দূরে। রশিতে ঝুলে ওখানে যাবেন কি করে? ফিরবেনই বা কি করে?'

'সে-সব তোমাকে ভাবতে হবে না। যা বলছি তাই করো।'

মিশ্রী খান ঝুঁকে পড়ল বাক্সগুলোর ওপর। রানা হুক লাগানো রশিটা ছুঁড়ে দিল দেয়ালের দিকে। খটাং শব্দ করে আটকে গেল সেটা দেয়ালের মাথায়।

হঠাৎ প্রায় অস্ফুট একটা বিস্ময়ধ্বনি বেরিয়ে এল মিশ্রী খানের মুখ থেকে। রানা ছুটে এল কাছে।

'কি ব্যাপার, মিশ্রী?'

'ওস্তাদ। বাক্সটা আমি নিজের হাতে গুছিয়েছিলাম। এটা সেই বাক্সই নয়!...এই যে, দাঁড়ান।' কয়েক সেকেণ্ড ঘাঁটাঘাঁটি করে চাপা ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, 'নেই। পো-বার্নিং ফিউজটা নেই।'

'কি যা-তা বলছ!' ঝুঁকে পড়ল রানা। হাত চালিয়ে দিল বাক্সের মধ্যে। 'অসম্ভব কথা। যাবে কোথায়? তুমি তো নিজের হাতে প্যাক করেছিলে?'

'করেছিলাম। কিন্তু কোনও শুয়োরের বাচ্চা খুলেছিল এটাকে। নিশ্চয়ই কেউ...'

'অসম্ভব! আজই দুপুরে তুমি খুলে সাজিয়েছ সব কিছু। তারপর থেকেই ওটা আরীফের পিঠে আছে সর্বক্ষণ। আরীফ কিছুতেই...'

'এটা আরীফের কাজ নয়,' গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল মিশ্রী খান।

'তাহলে? নিশ্চয়ই আছে। আবার খুঁজে দেখো, মিশ্রী।'

'হাজার খুঁজলেও আর পাওয়া যাবে না, ওস্তাদ।' মিশ্রীর কণ্ঠে অদ্ভুত একটা হতাশা ফুটে উঠল। 'আমারই দোষ। আমারই সাবধান হওয়া উচিত ছিল।'

'কি পাগলামি করছ, মিশ্রী। তোমার দোষ মানে? আমার সামনে প্যাকেট করেছ...' থেমে গেল রানা কথার মাঝখানে। চট করে উঠে দাঁড়াল সে। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। দক্ষিণ দিক থেকে একটা গুলির শব্দ ভেসে এসেছে। ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে মিলিয়ে গেল শব্দটা। চারদিক আবার নিস্তব্ধ।

এতক্ষণে আলতাফ আর নাজির বেগের রওনা হয়ে যাওয়ার কথা। সাগর পারে ইশরাতের দ্বিতীয় আস্তানা থেকে করাচির সাথে কথা বলে চলে যাবে ওরা সোমনাথের মন্দিরে। ইশরাত খাওয়া সেরে খানিকটা বিশ্রাম নেবে, রানা আর মিশ্রী খানের কাজ হয়ে গেলে ওদের পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবে সেখানে- কথা ছিল এই রকম। তাহলে গুলির শব্দ কিসের? আলতাফরা গুলি ছুঁড়ল? কিংবা ধরা পড়ে গেল? নাকি কোনও রকম ফাঁদ? ওরা খোঁজ নিতে গেলেই ধরা পড়বে সেই ফাঁদে?

এমনি সময় একটা মেশিনগান গর্জে উঠল। কান পেতে শুনবার চেষ্টা করছে রানা। বৃষ্টির জন্যে সব ঝাপসা হয়ে গেছে, কিছু দেখার উপায় নেই। এবার আরেকটা হালকা মেশিনগানের শব্দ কানে এল। তিন-চার সেকেণ্ড পরেই হঠাৎ এক সাথে থেমে গেল দুটো মেশিনগানই। কি ঘটছে ওখানে কিচ্ছু বুঝবার উপায় নেই। আর একমুহূর্ত সময় নষ্ট করল না রানা।

'জলদি, মিশ্রী!' ফিসফিস করে বলল রানা। 'আর সময় নেই। এগুলো সাথে নিয়ে যাচ্ছি আমরা। বেঁধে ফেলো। ওদিকে কিছু গোলমাল হয়েছে।'

আধ মিনিটের মধ্যে দেয়াল থেকে হুক খুলে রশি পেঁচিয়ে ফেলল রানা। এক্সপ্লোসিভের বাক্স দুটো ব্যাগের মধ্যে ভরে তুলে নিল কাঁধে। নিঃশব্দ পায়ে দৌড়ে চলল ওরা ছাদ টপকে টপকে আস্তানার দিকে। ইশরাতও নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে গুলির শব্দ?

ছাতের ওপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল একটা ছায়ামূর্তি। মাত্র ছয় ফুট দূরে। ইশরাত কোথায়? এই লোক কিছুতেই ইশরাত হতে পারে না। ইশরাতের চেয়ে অনেক লম্বা। চওড়াও। চিতাবাঘের মত অতর্কিতে লাফিয়ে পড়ল রানা লোকটার ওপর। প্রচণ্ড এক ঘুসি খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল ছায়ামূর্তিটা। সাথে সাথেই ওর বুকের ওপর চেপে বসে গলা টিপে ধরল মিশ্রী খান।

মারাই যেত, কিন্তু হঠাৎ কি মনে হতেই ঝুঁকে মুখটা দেখবার চেষ্টা করল রানা। বিকৃত হয়ে গেছে মুখটা, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে বাইরে- কিন্তু চিনতে পারল রানা।

'মিশ্রী! থামো, থামো! ছাড়ো ওকে- ও নাজির বেগ।'

রানার কথা শুনতে পেল না মিশ্রী খান। অদ্ভুত একটা জিঘাংসা জ্বলজ্বল করছে ওর দুই চোখে। আঙুলগুলো ক্রমেই বসে যাচ্ছে নাজির বেগের গলায়। দাঁতে দাঁত চেপে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে টিপে ধরেছে মিশ্রী খান, বাহ্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে যেন ও।

'ছাড়ো, মিশ্রী। আরে গর্দভ, ও নাজির বেগ। ছেড়ে দাও।' মিশ্রী খানের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল রানা। দুই হাতে মিশ্রীর কব্জি ধরে সরাবার চেষ্টা করছে সে হাত দুটো নাজিরের গলা থেকে। এবার সর্বশক্তি প্রয়োগ করল রানা, নইলে আর কয়েক সেকেণ্ডেই মৃত্যু ঘটবে নাজির বেগের।

হঠাৎ বুঝতে পারল মিশ্রী খান। উঠে দাঁড়াল ওর বুকের ওপর থেকে। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে ওর। নীরবে চেয়ে আছে সে নাজির বেগের দিকে।

'কি হয়েছে তোমার, ক্যাপ্টেন মিশ্রী খান? কালা হয়ে গেছ, নাকি অন্ধ হয়ে গেছ?' তিরস্কার করল রানা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে।

'কিছু একটা হয়েছিল হয়তো।' ডান হাতে গাল ঘষল মিশ্রী খান। 'আমি দুঃখিত, মেজর।'

'আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ না করে বরং ওর কাছে মাফ চাওয়া উচিত তোমার।' নাজির বেগের দিকে চাইল রানা। উঠে বসেছে সে। গলার ওপর হাত বুলাচ্ছে।

'মাফ চাওয়া-চাওয়ি পরেও হতে পারবে। ওকে জিজ্ঞেস করুন ও এখানে কেন, আর আরীফের কি হয়েছে।'

রেগে গিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা মিশ্রী খানকে। কি মনে করে সামলে নিল।

'আরীফ কোথায়, নাজির?'

বহু কষ্টে কথা বলল নাজির বেগ। থেমে থেমে ঢোক গিলে গিলে। সব শুনে সমাধি-পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে গেল রানা।

ওকে আর আলতাফকে একটু এগিয়ে দিতে গিয়েছিল আরীফ, কিন্তু ডানধারের গলিটা পেরিয়েই সামনে পড়ে সাত-আটজন সৈন্য। আরীফ ওদের মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে পথ মুক্ত করবার চেষ্টা করতে গিয়েছিল- মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে ওর বুক। আলতাফ সব ক'জন সৈন্যকে হত্যা করে আরীফের দেহটা কাঁধে তুলে নিয়ে চলে গেছে সোমনাথের মন্দিরের দিকে। ও এসেছে খবর দিতে। বাঁচবে না আরীফ। এতক্ষণে নিশ্চয়ই মারা গেছে।

তেরো

খেত-খামার ডিঙিয়ে চলছে ওরা তিনজন সোমনাথের মন্দিরের দিকে। রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা তফাতে ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে আড়ালে এগোচ্ছে ওরা। পিচ্ছিল ভেজা মাটির ওপর দিয়ে চলতে গিয়ে পতন থেকে বাঁচবার জন্যেই বেশি মনোযোগ ব্যয় হচ্ছে। মন্দিরের চুড়ো দেখা যাচ্ছে এখন। হঠাৎ একটা মাটির তৈরি পোড়ো ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল মিশ্রী খান। কথা বলে উঠল সে এতক্ষণ পর।

'আর পারছি না, ওস্তাদ। একটু বিশ্রাম না নিলে নির্ঘাত মারা পড়ব।

এই ঘরের মধ্যে মিনিট কয়েক বিশ্রাম নিয়ে নিলে কেমন হয়? বেশিক্ষণ না, এই একটা সিগারেট খেতে যতক্ষণ লাগে।'

অবাক হলো রানা। এত সহজে কাহিল হবার মানুষ তো মিশ্রী খান নয়। কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হয়ে গেল রানা। সে নিজেও অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করছে।

'ঠিক আছে, মিশ্রী। চলো, ঢুকে পড়ি।'

ঢুকে পড়ল ওরা তিনজন ছোট্ট ঘরটার মধ্যে। ফসল পাকলে মাঠ পাহারা দেয় কৃষকরা এই ঘরে শুয়ে-বসে। একটা বাঁশের মাদুর পাতা আছে ঘরের এক কোণে। মাদুরে বসে পড়ল রানা। চোখ তুলেই অবাক হয়ে গেল সে। সারা ঘরে দেয়াল ধরে ধরে কি যেন পরীক্ষা করছে মিশ্রী খান।

'কি হে, কি করছ? এই কি বিশ্রাম নেয়ার নমুনা?'

'না, ওস্তাদ। বিশ্রাম নিতে আসলে আসিনি। এই ঘরের মধ্যে ঢুকবার জন্যে ওই ছুতো ধরেছিলাম। আসলে আমি আপনাকে তিনটে অদ্ভুত জিনিস দেখাতে চাই।'

'অদ্ভুত জিনিস! কি অদ্ভুত জিনিস দেখাবে তুমি আমাকে?'

'একটু ধৈর্য ধরুন, ওস্তাদ। আপনার সময় আমি শুধু শুধু নষ্ট করব না। মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার।'

রানা অবাক হলো ঠিকই, কিন্তু মিশ্রী খানের ওপর থেকে ওর আস্থা টলল না একবিন্দুও। বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু বেশি দেরি করিয়ে দিয়ো না আবার।'

'দেরি হবে না। জানালা নেই এ ঘরে একটাও। নির্বিঘ্নে আলো জ্বালা যাবে। কিন্তু তাও আগে বাইরে থেকে একবার দেখা দরকার আলো দেখা যাচ্ছে কিনা।'

'আমি বাইরে গিয়ে দেখছি,' বলল নাজির বেগ।

'না না। আপনি খোঁড়া মানুষ, বসুন। আমি টর্চ জ্বালাচ্ছি, ওস্তাদ বাইরে থেকে ঘরটা একপাক ঘুরে দেখে আসবেন?' বলল মিশ্রী খান।

রানা নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল বাইরে। মিশ্রী খানের ব্যবহারটা রহস্যজনক মনে হচ্ছে। মতলব কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। কি দেখাতে চায় সে ওকে? বাইরে দিয়ে একপাক ঘুরে ফিরে গেল রানা ঘরের মধ্যে।

'এক বিন্দু আলোও যাচ্ছে না বাইরে।'

'বেশ,' কাঁধ থেকে ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে রাখল মিশ্রী খান। কিন্তু বসল না। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। বোধহয় মনে মনে গুছিয়ে নিল কথাগুলো।

একবার ঘড়ির দিকে চেয়ে মিশ্রীর দিকে চাইল রানা আবার। 'কি দেখাবে বলে আমাকে, মিশ্রী?' তাড়া দিল রানা।

'ঠিক। তিনটে জিনিস।' পকেট থেকে ম্যাচ বাক্সের সমান একটা ছোট্ট

কালো বাক্স মত কি যেন বের করল মিশ্রী খান। বলল, 'প্রথম এইটে দেখুন, ওস্তাদ।'

'কি ওটা?' জিজ্ঞেস করল বিস্মিত রানা।

'ক্লকওয়ার্ক ফিউজ।' পেঁচিয়ে বাক্সটার পেছন দিকটা খুলতে আরম্ভ করল মিশ্রী খান। 'বিশ্রী জিনিস। কিন্তু টিএনটি-র জন্যে অত্যন্ত দরকারী।' বাক্সটা খোলা হয়ে গেছে ততক্ষণে। টর্চের আলোর সামনে ধরল সেটা। 'কিন্তু এটা দিয়ে আর কোন কাজ হবে না। ঘড়ি ঠিকই আছে, কিন্তু কন্ট্যাক্ট আর্ম বাঁকিয়ে তুলে দেয়া হয়েছে ওপরে। টিক্ টিক্ বাজতে থাকবে ঠিকই, কিন্তু ম্যাচ বাতিও জ্বলবে না এটা দিয়ে।'

'আশ্চর্য! কিন্তু কিভাবে...'

'দুই নম্বর জিনিস,' মিশ্রী খান যেন রানার কথাটা শুনতেই পায়নি এমনভাবে নিজের কথাই বকে যেতে থাকল। ডিটোনেটার বক্স খুলল সে। ফেল্ট আর তুলোর ওপর থেকে আলতো করে দুই আঙুলে তুলল একটা ফিউজ। এটাও পরীক্ষা করল টর্চের আলোয়। তারপর সোজাসুজি রানার দিকে চেয়ে বলল, 'মারকারির ফাল্মিনেট, ওস্তাদ। মাত্র সেভেন্টি সেভেন গ্রেন, কিন্তু কারও আঙুল ক'টা উড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। খুবই নাজুক জিনিস। সামান্য একটু টোকা লেগেছে কি ফাঁৎ করে জ্বলে উঠবে।' মাটিতে ফেলে দিল ওটাকে সে, তারপর বুটসুদ্ধ একটা পা তুলে জোরে ফেলল ওটার ওপর। নিজের অজান্তেই চোখ বুজল রানা আধ সেকেণ্ডের জন্যে। কিন্তু কোনও বিস্ফোরণ হলো না।

'এটাও ঠিক কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে না, তাই না, ওস্তাদ?' এতক্ষণে একটা বক সিগারেট বের করে ঠোঁটে লাগাল মিশ্রী খান। আগুন ধরিয়ে কিছুক্ষণ টানল চুপচাপ। রানার কাছে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে আসছে এবার।

'তৃতীয় আরেকটা কি দেখাতে চেয়েছিলে?' শান্ত ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা।

'হ্যাঁ। আরেকটা জিনিস দেখাব আপনাকে। আমি আপনাকে একটা বিশ্বাসঘাতক, নীচ, বিষাক্ত, দুই-মুখো সাপ দেখাব।' কথাটা বলতে গিয়ে চাপা উত্তেজনা ফুটে উঠল মিশ্রী খানের কণ্ঠে। বিস্মিত রানা দেখল চক্ চক্ করছে মিশ্রী খানের হাতে ওর সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা। লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সেটা নাজির বেগের বুকের দিকে। 'জামাটা খুলে ফেলো, নাজির বেগ।'

'কি করছ, মিশ্রী? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোমার?' এগিয়ে যাচ্ছিল রানা। থেমে গেল মিশ্রী খানের ইঙ্গিতে। বলল, 'কি গোলমাল শুরু করলে তুমি?'

'গোলমাল অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে, ওস্তাদ। রাজগড়ের কাছে

গুহার মধ্যে আমরা ধরা পড়লাম কি করে? তুমুল বৃষ্টির মধ্যে ব্লাড হাউণ্ডের বাপ এলেও তো গন্ধ শুঁকে আমাদের বের করতে পারত না। যদি ব্লাড হাউণ্ডই ওদের পথ চিনিয়ে নিয়ে আসবে, তাহলে সেগুলো গেল কোথায়- আমরা বেরিয়ে তো ব্লাড হাউণ্ডের ছায়াও দেখতে পাইনি? চিন্তা করে দেখুন, ওস্তাদ, আমাদের ঘুমন্ত অবস্থায় কে ছিল গার্ড? নাজির বেগ। ওই নেড়ি কুত্তার বাচ্চাই পথ চিনিয়ে এনেছিল লেফটেন্যান্ট অলোক রায়ের দলকে। কি, বুঝতে পারছেন, ওস্তাদ? কাপড় খুলে ফেলো। তিন সেকেণ্ড সময় দিলাম, নইলে গুলি করব কব্জিতে।'

মিশ্রী খানকে নিরস্ত করবার জন্যে এগোতে যাচ্ছিল রানা। হঠাৎ চোখ পড়ল ওর নাজির বেগের ওপর। শ্বাপদের মত জ্বলছে তার চোখ জোড়া। দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। বন্য একটা হিংস্রতা ফুটে উঠেছে তার মিশকালো মুখে। পরমুহূর্তেই বিকৃত হয়ে গেল ওর মুখটা। 'দুপ্' করে একটা মৃদু শব্দ তুলে ওর বাম হাতের কব্জিতে প্রবেশ করল একটা পয়েন্ট থ্রী-টু ক্যালিবারের বুলেট। দুই চোখে ওর অবিশ্বাস।

'আরও তিন সেকেণ্ড সময় দিলাম। এবারে যাবে ডান হাতের কব্জি।' স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বলল মিশ্রী খান। পিস্তলটা তেমনি লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ইঙ্গিতের অপেক্ষায়। দ্রুত খুলে ফেলল নাজির বেগ গায়ের জামা। ওর চোখ জোড়া যেন বিষোদ্গার করছে মিশ্রীর চোখের দিকে চেয়ে।

'ঘুরে দাঁড়াও।'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল নাজির বেগ।

'বাহ্! চমৎকার! দেখুন, ওস্তাদ। চাবুক মেরে মেরে এই লোকটারই পিঠের চামড়া তুলে নিয়েছিল ভারতীয় সৈন্যরা। কি বীভৎস সাদা সাদা দাগ পড়ে গেছে- চাওয়া যায় না! এই না ছিল ওর বানানো গল্প? এরই জন্যে না সুযোগ পেলেই সে পাগলের মত খুন করে বেড়াচ্ছে ভারতীয় সৈন্যদের? দাউ দাউ করে জ্বলছে ওর মনের মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন?'

রানার মাথার মধ্যে সব গোলমাল পাকিয়ে গেল। চক্‌চকে কালো মসৃণ পিঠে একটা দাগও নেই।

স্প্যান্টের পা'টা ওপর দিকে তোল, নিমকহারাম। তিন সেকেণ্ড সময় দিলাম।'

কথা মত কাজ করল নাজির বেগ। প্যান্টের পা গুটিয়ে তুলে ফেলল হাঁটুর ওপর।

'আরও একটু। হ্যাঁ। চমৎকার! এবার ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলো। জলদি!' কয়েক সেকেণ্ড পার হয়ে গেল। উল্লসিত কণ্ঠে বলল মিশ্রী খান, 'আহা-হা। কি সা`ঘাতিক জখম, তাই না, ওস্তাদ?'

কোনও রকম ক্ষতচিহ্ন নেই নাজিরের পায়ে।

'বুঝলাম, মিশ্রী খান। এবার বুঝতে পেরেছি।' চিন্তিত রানা বলল মৃদুস্বরে। 'কিন্তু বুঝতে পারছি না কেন…'

'সহজ ব্যাপার। ব্যাটা অসম্ভব ধূর্ত আর হারামী। আত্মসম্মান-জ্ঞান সম্পন্ন কোনও জাত-গোক্ষুর সাপও ওর আধমাইলের মধ্যে আসবে না। এই জখম-পায়ের দোহাই দিয়ে পড়ে থাকল ভাতিজা একটা গুহার মধ্যে আমরা যখন প্রথম গুলি চালালাম ভারতীয় সৈন্যদের ওপর। আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে চিঠি লিখে ফেলল। আমাদের সাথে চলবার সময় খোঁড়াতে খোঁড়াতে পিছিয়ে পড়ে চিঠিটা ফেলে দিল চোখে পড়বার মত কোনও জায়গায়। তাতে খুব সম্ভব লেখা ছিল আমরা অমুক সময়ের দিকে অমুক জায়গায় আসছি, আমাদের অভ্যর্থনার যেন সুবন্দোবস্ত থাকে। অভ্যর্থনা কমিটি তৈরিই ছিল- আমরা গুহা-মুখ থেকে বেরিয়ে প্রায় ধরা পড়তে যাচ্ছিলাম, খেয়াল নেই? ওদের ট্রাক নিয়েই ঢুকেছি আমরা শহরে। তখনই প্রথম সন্দেহটা হলো আমার। বুঝলাম, গুহা মুখে ওকে ফেলে রেখে আসবার জন্যে যে করুণ মিনতি জানিয়েছিল ভাতিজা, সেটা আসলে পেছনের সৈন্যদের ঠিক গুহাটা চিনিয়ে দেবার জন্যেই- মহান আত্মত্যাগ নয়। তাই উপত্যকায় বেরিয়েই সৈন্য দেখে মাথার পেছনে টোকা মেরে অজ্ঞান করে ফেলেছিলাম ওকে, যাতে নতুন কোনও বিপদ ঘটাতে না পারে।'

'সব পরিষ্কার হয়ে আসছে আমার কাছে। কিন্তু আরও আগে আমাকে জানানো উচিত ছিল তোমার। এভাবে চেপে গিয়ে…'

'আমি বলতে চেষ্টা করেছি, ওস্তাদ, কিন্তু সুযোগ পাইনি। ও কিছুতেই সঙ্গ ছাড়েনি। সব সময় সাথে লেগে ছিল আঠার মত। ছাতের ওপর তখন বলতে যাচ্ছিলাম, অমনি গোলাগুলি আরম্ভ হয়ে গেল।'

'এখন বুঝতে পারছি, হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত আমাদের ওপর বোমা ফেলতে আরম্ভ করেছিল কেন প্লেনগুলো আজ দুপুরে।'

'হ্যাঁ। আয়না দেখিয়ে আমাদের পজিশন জানিয়েছিল ও এই দুর্গকে। এবং সময় থাকতে নিজে সরে গিয়েছিল নিরাপদ দূরত্বে। তার আগেই সে আরীফের ব্যাগ থেকে বের করে ক্লক ফিউজ, পো বার্নিং ফিউজ আর ডিটোনেটার নষ্ট করে দিয়েছে ওর ঘুমন্ত অবস্থায়। শুধু দুঃখ, ভাতিজা শেষ রক্ষা করতে পারল না।'

'নিজেকে রক্ষা করতে পারল না, কিন্তু আরীফকে শেষ করে দিয়ে গেল,' বলল রানা।

'আমার মনে হয় আরীফ ঠিকই আছে। নিজে রয়ে গিয়ে আরীফকে ও-ই পাঠিয়েছে আলতাফের সঙ্গে আহত পায়ের ছুতো দেখিয়ে। ওরা বেরিয়ে যেতেই খবর দিয়েছে দুর্গের গেটে যেন সোমনাথের মন্দিরে ডজন খানেক সৈন্য পাঠানো হয়, এবং যাবার সময় যেন গোটা কয়েক ফাঁকা আওয়াজ করে

মেশিনগানের। আমাদের দু'জনকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যেই আসলে ছাতে উঠেছিল ও। ওর পকেট সার্চ করলেই সিগন্যাল টর্চ বেরিয়ে পড়বে আমার যতদূর বিশ্বাস।'

প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা টর্চ বের করে আনল রানা।

'মৃত্যুর আগের মুহূর্তে কেমন লাগছে, নাজির বেগ? জানতে ইচ্ছে করছে আমার। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ তোমাকে খুন করব আমি, এবং এক্ষুণি। কিছু বলবার আছে তোমার?'

আহত হাতটা অন্য হাতে চেপে ধরে আছে নাজির বেগ। কোনও কথা বলল না। তীব্র ঘৃণা ফুটে উঠল ওর দৃষ্টিতে, তেমনি চেয়ে রইল সে মিশ্রীর চোখে চোখে।

'ভাতিজা বুঝেছে, কিছু বলে কোনও লাভ নেই। তাই চুপ করে আছে। ওস্তাদ, আপনার মূল্যবান সময় আর নষ্ট করতে চাই না। কি বলেন? দোষী?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। সিগারেটটা মাটিতে ফেলে বুট দিয়ে পিষে ফেলল মিশ্রী খান। তারপর যত্নের সাথে পর পর দুটো গুলি করল নাজির বেগের হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে। মৃতদেহটা মাটির ওপর আছড়ে পড়বার আগেই ব্যাগ দুটো কাঁধে তুলে নিয়ে টর্চ নিভিয়ে দরজার কাছে পৌঁছে গেল ওরা।

স্পারছি না, ক্যাপ্টেন আলতাফ, গিঁঠগুলো খুব শক্ত,' হতাশ কণ্ঠে বলল ইশরাত।

'তাতে কি হয়েছে? ভেজা রশি দিয়ে বেঁধেছে তো, না কেটে খোলা মুশকিল। দেখা যাক অন্য কোনও বুদ্ধি বের করা যায় কিনা।' আশ্বস্ত করল আলতাফ ইশরাতকে। দুই মিনিট আগে যে সে হাত-বাঁধা অবস্থাতেই লোহার মত শক্ত আঙুল দিয়ে ইশরাতের হাতের বাঁধন খুলে দিয়েছে কয়েক টানে, সে-কথা বেমালুম চেপে গেল আলতাফ।

ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলাল আলতাফ। একটা হারিকেন জ্বলছে মিটমিট করে। মন্দিরের শান বাঁধানো মেঝেতে পড়ে আছে ওরা দু'জন। নিজেদের দুরবস্থার কথা চিন্তা করে হাসি পেল আলতাফের। একই দিনে দ্বিতীয়বার বন্দী হয়েছে ওরা। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! এবারও বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে ওদের। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে পৌঁছেচে ভারতীয় সৈন্য। অনায়াসে বন্দী করেছে ওদের। ক্যাপ্টেনের মুখেই শুনেছে ওরা নাজির বেগের ভূমিকা। বিশ্বাস করেনি। কিন্তু অবিশ্বাসই বা করবে কোন্ ভরসায়? সব ব্যাপার যে মিলে যাচ্ছে। ক্যাপ্টেনের কথা যদি সত্য হয়, তাহলে এতক্ষণে রানা আর মিশ্রী খানও ধরা পড়ে গেছে। তবে কি এখানেই সব আশা সব ভরসা শেষ? পরাজিত হলো ওরা? কথাটা কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারল না সে মনে মনে।

হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই ঝট্ করে ফিরল সে ইশরাতের দিকে।

কাছেই জ্বলছে হারিকেনটা।

'আরীফ!' ডাকল সে মৃদুস্বরে।

'বলুন।' ইশরাত ফিরল ওর দিকে।

'হাতে একটা কাপড় জড়িয়ে হারিকেনের কাঁচটা খুলে ফেলো। মেঝেতে একটা টোকা দিয়ে ভেঙে ফেলো কাঁচটা। ওটা দিয়ে অনায়াসে কেটে দিতে পারবে আমার হাতের বাঁধন।'

অবাক হয়ে ওর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল ইশরাত। এই ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যেও বুদ্ধি হারায়নি লোকটা। একটা না একটা ফন্দী ফিকির বের করবার চেষ্টায় আছে। আশ্চর্য এই দলের প্রত্যেকটি লোক!

মেঝের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলে গেল ইশরাত হারিকেনের কাছে। পা দুটো এখনও বাঁধাই আছে ওর। হারিকেনের দিকে হাত বাড়িয়ে হঠাৎ কি একটা শব্দ কানে যেতেই থমকে গেল ও। মাথাটা তুলে দেখল দরজার শিকের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে এসেছে একটা রাইফেলের ব্যারেল। আবার ব্যারেল দিয়ে খটাখট বাড়ি মারল অসহিষ্ণু প্রহরী শিকের ওপর।

'আর এক ইঞ্চি হাত বাড়িয়েছ কি ছাতু করে দেব কব্জিটা।'

'থাক, আরীফ, ফিরে এসো এখানে,' বলল আলতাফ।

ফিরে এল ইশরাত। কিন্তু প্রহরীকে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠতে দেখা গেল। রাইফেলটা বের করে নিল সে শিকের ফাঁক থেকে। একজোড়া বুটের শব্দ দ্রুত চলে গেল ডান দিকে।

এমনি সময় একটা শব্দ কানে এল ওদের। গজ বিশেক দূরে যেন কেউ কপাট বন্ধ করল একটা। এবার একাধিক পায়ের শব্দ শোনা গেল। দ্রুত এগিয়ে আসছে এই ঘরের দিকে। বোধহয় প্রহরী ইশরাতের হাত বাঁধন-মুক্ত দেখে আরেকজনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরছে। চাবি ঘুরিয়ে ক্লিক করে তালা খোলার শব্দ এল। বিচিত্র ক্যাঁচকুঁচ শব্দ করে খুলে গেল দরজা। দু'জন সৈন্য এসে ঢুকেছে মন্দিরে। প্রথমেই ইশরাতের চোখ পড়ল দু'জোড়া কাদা মাখা ভেজা বুটের ওপর। পরমুহূর্তে ভেসে এল একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর।

'ছাগলের মত বেঁধে রেখেছে, ওস্তাদ! কোরবানির খাসী! ইয়া আল্লা, দুই ভাতিজারই অবস্থা কাহিল!'

ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত হয়ে গেল ইশরাত ও আলতাফ। কয়েক সেকেণ্ড কেউ কোনও কথা বলতে পারল না। ইশরাতই প্রথম সামলে নিল।

'ওই বিশ্রী গোঁফ-ওয়ালা লোকটা বেঁচে আছে তাহলে? আর কোনদিন দেখা হবে বলে ভাবতে পারিনি।'

'ঠিক বলেছ, আরীফ,' বলল আলতাফ। 'ব্যাপার কি, রানা? দিব্যি বহাল তবিয়তেই আছ দেখছি!'

'হ্যাঁ, আছি। এর জন্যে সবটুকু কৃতিত্ব মিশ্রী খানের সন্দেহপ্রবণ বিশ্রী

মনের। আমরা যখন নাজির বেগ বলতেই অজ্ঞান, ও তখন ভেতর ভেতর প্যাঁচ কষছে।'

'কোথায় নাজির বেগ?' জিজ্ঞেস করল ইশরাত।

'নাজির বেগ?' জবাব দিল মিশ্রী খান। 'ওকে রেখে এসেছি মাঠের মধ্যে একটা ঘরে। হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে বেচারার।'

মনের আনন্দে বেসুরো শিস দিতে দিতে বাঁধন কাটতে থাকল সে একটা ছুরি দিয়ে। রানা নিজেদের ঘটনাগুলো সংক্ষেপে বলল ওদের এবং ওদের সব কথাও শুনল মন দিয়ে। উঠে দাঁড়াল প্রকাণ্ডদেহী আলতাফ ব্রোহী। হাতের কব্জি দুটো ঘষল অল্পক্ষণ, তারপর বলল, 'শিসটা বড় বিশ্রী লাগছে মিশ্রী খান। একে তো বেসুরো, তার ওপর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। বাইরে গার্ড...'

'ওসব তোমার চিন্তা করতে হবে না, ভাতিজা। ওরা কল্পনাও করতে পারেনি যে আমরা এসে উপস্থিত হব। মাত্র দু'জন দুর্বল চরিত্রের গার্ড রেখেই নিশ্চিন্তে ফিরে গেছে দ্বারোকায়।'

'তোমরা করাচিকে পেয়েছিলে, আলতাফ?' রানা কাজের কথায় এল।

'হ্যাঁ। খবর অত্যন্ত গরম। চমৎকার রিসেপশন। খোদ কমোডোর জুলফিকার ছিলেন সেটের সামনে। উত্তেজনায় তোতলাচ্ছিলেন তিনি। সারাদিন আমাদের সংবাদ না পেয়ে ভয়ঙ্কর উৎকণ্ঠার মধ্যে কেটেছে ওঁর। জিজ্ঞেস করলেন আমাদের অবস্থা। বললাম, এখনও দুর্গে ঢুকতে পারিনি, তবে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ঢুকতে পারব আশা করছি।' দম নেয়ার জন্যে থামল আলতাফ।

'তারপর?'

'উনি বললেন আমাদের জাহাজ আজ রাত বারোটায় আক্রমণ করবে দ্বারোকা দুর্গ। তার আগেই শেষ করতে হবে দুর্গের চারটে কামান। নইলে মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে পাকিস্তানের। বললাম, কিছু একটা তো এখনও গোলমাল হয়ে যেতে পারে। উনি বললেন, মেজর মাসুদ রানা আর ক্যাপ্টেন মিশ্রী খান থাকতে উনি সেসব নিয়ে ভয় পান না। বারোটার আগে সব কাজ শেষ করা চাই।'

'সবাই রেডি?' রানা জিজ্ঞেস করল। 'আমাদের সরে পড়তে হবে এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। নাজির বেগের সিগন্যাল না পেয়ে ওরা বুঝতে পারবে, হয় নাজির আমাদের খুঁজে পায়নি, নয় ওকে শেষ করে দিয়েছি আমরা। কিন্তু যে-কোনও অবস্থাতেই আমরা যে সোমনাথের মন্দিরের দিকেই এসেছি তাতে ওদের নিশ্চয়ই কোনও সন্দেহ নেই। এতক্ষণে অর্ধেক পথ চলে এসেছে ওরা। দেরি করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। যে করে হোক আজই রাত বারোটার মধ্যে কাজ সারতে হবে আমাদের। আজই দ্বারোকায় আমাদের শেষ রাত। পা চালাও সবাই।'

চোদ্দ

রাত আটটা। সাড়ে-আটটা থেকে কারফিউ। দ্রুত তৈরি হয়ে নিচ্ছে সবাই।

ইশরাত একটা লম্বা রশিতে এক হাত পর পর গিঁঠ দিয়ে ফেলেছে, এখন একটা বাঁশের কঞ্চির মাথায় বাঁকানো লোহার হুক বাঁধছে শক্ত করে। কঞ্চিটা সোমনাথের মন্দির থেকে ফিরবার পথে ভেঙে এনেছে ওরা। তিনটে ট্রাক ভর্তি সোলজার দেখে একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে লুকিয়েছিল ওরা। ওখান থেকেই কঞ্চিটা জোগাড় করেছে ইশরাত।

ট্রাকের ভারি বারো ভোল্টের ব্যাটারি নিয়ে এসেছে ওরা ছাতের ওপর তিরপল ঢেকে। ব্যাটারিটা চুরি করে এনেছে মিশ্রী খান। একটা গুদাম ঘরের সামনে দাঁড়ানো সাতটনের মাল-টানা ট্রাক থেকে। পো বার্নিং ফিউজ, ক্লক-ওয়ার্ক ফিউজ, সব নষ্ট হয়ে যাওয়াতে এখন একমাত্র ভরসা ব্যাটারি।

দুর্গ প্রাচীরের উত্তর দিকে চলে এসেছে ওরা। অফিসারস্ কোয়ার্টারের ছাতের ওপর ওরা এখন। দুর্গের সামনে সমুদ্রের দিকে অন্ধকার জেটি দেখা যাচ্ছে আবছা। বাড়িতে একটি প্রাণীও নেই। দুর্গের মধ্যেও বিশেষ লোকজন আছে বলে মনে হলো না রানার। কয়েকশো সৈন্য অফিসারদের অধীনে ভাগ ভাগ হয়ে সারা শহর চষে ফেলছে এখন রানাদের খোঁজে। একদল আবার গেছে সোমনাথের মন্দিরের দিকে।

'চমৎকার জায়গা বের করেছ, আরীফ। গাঁজা খেয়েও ওরা কল্পনা করতে পারবে না যে ওদের অফিসারস্ কোয়ার্টারের ছাতে আমরা এখন নিশ্চিন্তে বৃষ্টিতে ভিজছি,' বলল মিশ্রী খান।

'হ্যাঁ। কেউ কসম খেয়ে বললেও ওরা বিশ্বাস করবে না,' বলল আলতাফ।

ছাতের কিনারে দাঁড়িয়ে দুর্গের দিকে চেয়ে দেখল রানা। মাত্র চল্লিশ ফুট দূরে তিরিশ ফুট উঁচুতে দেখা যাচ্ছে চারটে প্রকাণ্ড কামানের মুখ। পাহাড়ী এলাকায় তৈরি করা হয়েছে এই দুর্গ। পাহাড়ের একটা গুহামুখে বসানো হয়েছে কামানগুলো। কোনও দিক থেকেই এগুলো ধ্বংস করবার উপায় নেই- জাহাজ তো ভিড়তেই পারবে না কাছে, প্লেন থেকে বম্বিং করলে হয় পাহাড়ের ওপর পড়বে, নয় সাগরে। রীতিমত মাথা খাটিয়ে দুর্ভেদ্য করা হয়েছে এই দুর্গকে।

চারপাশ ভাল করে দেখে নিয়ে ফিরে এল ওরা ঘরের ভেতর।

'চলো, মিশ্রী। আজকের নাটকে তুমিই নায়ক। সময় হয়ে এসেছে আমাদের।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রানা আর মিশ্রী খান পৌঁছে গেল ইশরাতের নির্দেশিত কাফেতে। কাফের চাইতে 'বারে'র আর্কষণই গ্রাহকদের কাছে বেশি। কয়েকজন বুঁদ হয়ে বসে আছে চেয়ারে হেলান দিয়ে, সামনে টেবিলের ওপর আধ-খাওয়া গেলাস।

কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগল কাফেটা রানার কাছে। আসন্ন কারফিউ এর কারণ হতে পারে। বসে পড়ল ওরা কোণের টেবিলে। বেয়ারা এসে দাঁড়াতেই দুটো ব্র্যাণ্ডি আনতে বলল রানা।

কাফের বাঙালী মালিক রুচিসম্পন্ন লোক মনে হলো। একটা রেডিয়োগ্রামে ওস্তাদ আবদুল করিম খানের থারটি থ্রী স্পীড লং-প্লে রেকর্ড বাজছে। ঠুমরী। সময়টা বর্ষণ মুখর সেপ্টেম্বর মাস হলেও 'ফাগুয়া ব্রিজ দেখন কো চালোরী' একটা অপূর্ব আবেশ ছড়িয়েছে অনতিপ্রশস্ত কাফের মদির অভ্যন্তরে। ইশরাতের কথা মনে পড়ে গেল রানার। রওনা হবার আগের মুহূর্তে আড়ালে ডেকে নিয়ে হঠাৎ গলা জড়িয়ে ধরেছে সে রানার, ফিসফিস করে বলেছে, 'নিজের প্রতি লক্ষ রেখো, রানা। কথা দাও, কোনও রকম অনাবশ্যক ঝুঁকি নেবে না!'

কথাগুলো বারবার ঘুরে ফিরে আসছে ওর মনের মধ্যে। ওদিকে ফাগুনের গান ছেড়ে ভৈরবী ধরেছেন ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ। মেয়েলী গলায় গাইছেন 'যমুনা কে তীর…।' রানা ভাবছে এটা কি তিন-তিনবার ওর প্রাণ রক্ষা করার জন্যে ইশরাতের কৃতজ্ঞতা? গালের ওপর ওই দু'ফোঁটা পানি কি বৃষ্টির পানি?'

এক মিনিট, দুই মিনিট করে সময় পার হয়ে যাচ্ছে। আটটা পঁচিশ। পেটের মধ্যে পাকস্থলীতে অদ্ভুত এক ধরনের বিজাতীয় অনুভূতি হলো রানার। ইশরাতের চিন্তা আপনা-আপনি সরে গেল ওর মন থেকে। পর পর দুই আউন্স ব্র্যাণ্ডি খেয়ে অনেকখানি চাঙ্গা বোধ করছে সে এখন। সেই তিনজন সামরিক পোশাক পরা লোক তেমনি বসেবসে গল্প করছে আর কফি খাচ্ছে। খুব সম্ভব দুর্গে কেরানিগিরি জাতীয় কোনও কাজ করে। ইশরাত বলেছে ঝড় হোক বৃষ্টি হোক রোজ সন্ধ্যার পর এখানে এসে বসে আWডা মারা ওদের রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাক্ষিণাত্যের লোক ওরা।

'আর কতক্ষণ, ওস্তাদ?' অধৈর্য হয়ে উঠছে মিশ্রী খান।

স্পাঁচ মিনিট,' আশ্বাস দিল রানা।

কাফেটা বন্ধ করবার জোগাড় করেছে দোকানদার। জানালাগুলো লাগিয়ে দিয়ে কয়েকটা বাতি নিভিয়ে খরিদ্দারদের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে যে এবার গাত্রোত্থান করতে হবে। একজন দু'জন করে সবাই বেরিয়ে গেল, কেউ ছাতা মাথায় দিয়ে, কেউ রেইন-কোট গায়ে। উত্তেজনায় মিশ্রী খানের কপালের একটা শিরা ফুলে উঠেছে। হাত দুটো কাঁপছে অল্প অল্প- চোখ

দুটো যেন বসে গেছে আরও খানিকটা। আগামী কয়েক মিনিটের মধ্যে নির্ধারিত হয়ে যাবে ওদের ভাগ্য। এই ক'দিনের এত কষ্ট, এত পরিশ্রম সব কিছুর সার্থকতা নির্ভর করছে আগামী দুই মিনিটের মধ্যে যে কাজটা ওরা করতে যাচ্ছে তার সাফল্যের ওপর। রানা ভাবল আজ রাত মিশ্রী খানের রাত। কিন্তু সময় কাটছে না কিছুতেই।

আটটা বেজে আটাশ মিনিট হতেই উঠে দাঁড়াল রানা। মিশ্রী খান বসে রইল। দরজার কাছে গিয়ে বাইরে বৃষ্টি দেখল রানা। আরও দেখল, রাস্তার ওপর কাছে-কিনারে একটি জন-প্রাণীও নেই। পকেট হাতড়ে কি যেন খুঁজছে রানা। ভ্রূ-কুঁচকে গেছে। কাউন্টারের দিকে না এগিয়ে আবার টেবিলের দিকে যাচ্ছে সে। চোখে পড়ল, উঠে দাঁড়িয়েছে মিশ্রী খানও। হঠাৎ থেমে দাঁড়াল রানা সামরিক পোশাক পরা লোকগুলোর টেবিলের তিনফুট তফাতে। হাতটা বেরিয়ে এল পকেট থেকে।

'একটুও নড়াচড়া করবে না!' পরিষ্কার হিন্দীতে বলল রানা। ওর ডান হাতে শোভা যাচ্ছে পয়েন্ট থ্রী-টু ক্যালিবারের ওয়ালথার পি. পি. কে। ওস্তাদ আবদুল করিম খান তখন গাইছেন ঝিঁঝিট ঠুমরী। 'পিয়া বিনে ন্যহি আওত চ্যয়ন'-এর পরিবেশ পাল্টে গেল এক মুহূর্তে। গমগম করে উঠল আবার রানার গম্ভীর কণ্ঠস্বর। 'একচুল নড়লে স্রেফ খুন করে ফেলব! আমরা বেপরোয়া লোক!'

স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল লোকগুলো কয়েক মুহূর্ত। হঠাৎ একজন নড়ে উঠল ওদের মধ্যে, ডান কাঁধটা ওপর দিকে উঠল, পরমুহূর্তেই একটা আর্তধ্বনি বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। ডান বাহুতে এসে প্রবেশ করল মিশ্রী খানের সাইলেন্সড় পিস্তল থেকে খানিকটা তপ্ত সীসা। বাম হাতে চেপে ধরল ডান বাহু- রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেল আঙুলগুলো।

'অতএব, সাবধান!' গোঁফে তা দিল মিশ্রী খান।

কাফের ম্যানেজারের দিকে ফিরল রানা। পাতলা লম্বা লোক, চিবুকে চুটকি দাড়ি। গোঁফ জোড়া ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে- ঠোঁটের ওপর মাঝামাঝি জায়গা খানিকটা কামানো। মাথায় বাবরি। চোখে সুরমা। অষ্টম শতাব্দীর বোগদাদী ফল বিক্রেতার মত চেহারা। পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করল রানা, 'এদের মধ্যে কেউ বাঙালী আছে?'

'না। হ্যাতারা বাঙ্গালোরের লোক- হিন্দীই জানে ন সই মতন।' সামলে নিয়েছে সে। কথার টানে রানা বুঝল খাস নোয়াখালীর লোক।

'বেশ। এদের কোথায় লুকানো যায় বলতে পারবেন?'

'ঠাইট মারি লাইব আঁরে, হুজুর।'

'না, মারবে না।' পিস্তল ধরল রানা ওর পাঁজরের সাথে ঠেসে। একবার চোখ টিপে বলল, 'ওদের সাথে আপনাকেও বেঁধে রেখে যাব। ভয় নেই। তাহলে হবে তো?'

‘সারব। কাউন্টারের ফিছনে হিঁয়ান দি আংগোর গুদাম গর। দরোজা খুলি হিঁয়ানেই আংগোরে বান্দি রাখতো ফারেন।’ চোখে মুখে স্পষ্ট ভীতির চিহ্ন ফুটিয়ে তুলল ম্যানেজার। বুঝে ফেলেছে সে ব্যাপারটা। দু’জন বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছিল। হাতের ইশারায় কেটে পড়তে বলল ওদের রানা। মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা কিচেনের দরজা দিয়ে। ফিরে এল রানা সামরিক পোশাক পরা লোকগুলোর টেবিলে।

‘জামা কাপড় সব খুলে ফেলো!’ আদেশ দিল রানা।

স্পাকিস্তানী কুত্তা!’ গাল দিল গুলি খাওয়া লোকটা।

‘আধ মিনিট সময় দিলাম, শার্ট-প্যান্ট খুলে ফেল।’ একই সুরে বলল রানা।

আবার অকথ্য গালি দিল লোকটা। আদেশ পালনের ভাব প্রকাশ পেল না ওদের কারও মধ্যে। ‘দুপ’ করে আরেকটা শব্দ হলো। একজনের হাতের তালু ফুটো করে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। তাজ্জব হয়ে হাতের ফুটোর দিকে চেয়ে রইল লোকটা, ব্যথায় কুঁচকে গেছে মুখ।

‘ইউনিফরমটা আর নষ্ট করলাম না। ওগুলোই আমাদের দরকার কিনা!’ যেন স্বাভাবিক আলাপ-আলোচনা করছে এমনি ভাবে বলল মিশ্রী খান। পিস্তলের মুখটা এবার কপাল বরাবর উঠল। ‘কিন্তু এবার দুই চোখের ঠিক মাঝখানটায় তাক করব। তখন কাপড় খুলে নিতে আমাদের খুব বেশি কষ্ট পেতে হবে না।’

কথা শেষ হবার আগেই জামা কাপড় খুলতে আরম্ভ করেছে তিনজন। রাগে অপমানে আর ব্যথায় ফোঁপাচ্ছে আহত দু’জন। বেঁটে একজন লোকের কাঁধের ওপর একটা চাপড় লাগাল মিশ্রী খান।

‘তোমার খুলতে হবে না, ভাতিজা। ওই জামা আমার দশ বছরের ছেলের গায়েও লাগবে না।’

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সামনের সুইং ডোর ঠেলে বেরিয়ে এল ওরা নির্জন রাস্তায় ভারতীয় সামরিক পোশাক পরে। তুমুল বর্ষণ হচ্ছে। একটি জন-প্রাণীর চিহ্ন দেখা গেল না লম্বা রাস্তায়। রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলল ওরা বৃষ্টিকে তুচ্ছ করে। পঞ্চাশ গজ গিয়ে হাতের ডাইনে মোড় নিল ওরা। ইশরাতের আস্তানার পাশ দিয়ে আসবার সময় কয়েক সেকেণ্ড থামল কেবল। দরজা দিয়ে একটা ফর্সা হাত বেরিয়ে এল। দুটো মিলিটারি ব্যাগের ভারে নুয়ে আছে হাতটা। ব্যাগের মধ্যে আছে রশি, ফিউজ আর অত্যন্ত শক্তিশালী এক্সপ্লোসিভ। ব্যাগদুটো কাঁধে ঝুলিয়ে নিল রানা আর মিশ্রী খান। হুক লাগানো কঞ্চিটা এগিয়ে দিল ইশরাত এবার, মৃদু চাপ দিল রানার হাতে। চাপা গলায় বলল, ‘সব ঠিক আছে। ক্যাপ্টেন আলতাফ চলে গেছে ওর পজিশনে। আমি এক্ষুণি ফিরে যাচ্ছি অফিসারস্ কোয়ার্টারে। সব কিছু রেডি। খোদা হাফেজ।’

এগিয়ে গেল ওরা রাস্তা ধরে দুর্গের দিকে। একটা বন্ধ হেয়ার-কাটিং সেলুনের বারান্দায় অন্ধকারে দাঁড়াল। ইঙ্গিত পেলেই রওনা হবে। তিরিশ গজ দূরে দেখা যাচ্ছে দুর্গ তোরণে দাঁড়ানো দু’জন সশস্ত্র প্রহরীকে। অ্যাটেনশন্ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

দেড় মিনিটের বেশি অপেক্ষা করতে হলো না। শহরের মাঝামাঝি এলাকায় একটা ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হলো। চারশো গজও হবে না ওখান থেকে। সাথে সাথেই শোনা গেল একটা মেশিনগানের গর্জন। আবার পর-পর কয়েকটা বিস্ফোরণের শব্দ এল। হ্যাণ্ড গ্রেনেড আর মিশ্রী খানের তৈরি গোটা কতক বোমা নিয়ে মেতে গেছে আলতাফ নকল যুদ্ধে।

তীব্র একটা সার্চ লাইটের আলো জ্বলে উঠল দুর্গ তোরণের খিলানে। সমস্তটা রাস্তা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

আরও আধ মিনিট অপেক্ষা করে লাফিয়ে রাস্তায় পড়েই পাগলের মত ছুটল ওরা দুর্গের দিকে। হুক লাগানো কঞ্চিটা বগলে চেপে রেখেছে রানা। কয়েক সেকেণ্ডে পৌঁছে গেল ওরা গেটের কাছে। কয়েক পা এগিয়ে এল গার্ড দু’জন ব্যাপার কি জানার জন্যে।

‘ছোটো সবাই আলিবাবা স্ট্রীটে!’ চিৎকার করে বলল রানা। স্পাকিস্তানী কুত্তাগুলো আটকা পড়েছে একটা বাড়িতে! মর্টার নিতে ফিরে এসেছি আমরা। জল্দি ছোটো তোমরা। জল্দি!’

‘কিন্তু গেটে থাকবে কে?’ হতবুদ্ধি গার্ডদের একজনের চেতনা ফিরল। কিন্তু বিন্দুমাত্র সন্দেহ করল না সে রানাদের। বিস্ফোরণের শব্দ, অঝোর বৃষ্টি, সামরিক পোশাকে ওরা দু’জন- সন্দেহের কথা মনে আসাটাই অস্বাভাবিক। বলল, ‘গেট ছেড়ে যাব কি করে?’

‘বুদ্ধু কাহিঁকে!’ ধমকে উঠল রানা। ‘এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঙুল চুষে লাভ কি? হারামজাদারা এখন আলিবাবা স্ট্রীটে। ওদের ধ্বংস করতে হবে! ভগবানের দোহাই লাগে, ছোটো, এবারও যদি হাতছাড়া হয়ে যায় আমাদের সব ক’জনের হাতে হাতকড়া পড়বে।’

কথা শেষ হবার আগেই ছুটল গার্ড দু’জন আলোকিত রাস্তা ধরে। আধ মিনিটের মধ্যেই দ্বারোকা দুর্গের মাঝখানে চলে এল রানা ও মিশ্রী খান।

চারদিকে হট্টগোল বেধে গেছে দুর্গের মধ্যে। কেউ চিৎকার করে হুকুম করছে, কেউ হুইসল্ বাজাচ্ছে, কেউ বা সগর্জনে ট্রাকের এঞ্জিনে স্টার্ট দিচ্ছে, কয়েকজন সার্জেন্ট ছোটাছুটি করছে এদিক ওদিক ব্যস্ত ভাবে। রানা আর মিশ্রী খানও দৌড়াচ্ছে সমানে। খুব যে তাড়াহুড়ো আছে ওদের তা নয়, কিন্তু দুর্গের অভ্যন্তরে আর সবার গতিবিধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চললে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে, তাই ওদেরকে দৌড়াতে হচ্ছে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে।

হাতের বামে দুটো ব্যারাক পড়ল, ডাইনে পাওয়ার হাউস। তারপর একটা অস্ত্রের গুদাম, তারপর মস্ত ওয়াটার ট্যাঙ্ক। সিনিয়র অফিসারস্ কোয়ার্টারের সামনে চলে এল ওরা। দুর্গের সবকিছু রানার মুখস্থ, প্রত্যেকটা জিনিসই চিনতে পারছে সে অক্লেশে। ব্রিগেডিয়ারের কোয়ার্টারের সামনে থামল রানা। মনস্থির করে নিয়েই হুড়মুড় করে উঠে এল চার-পাঁচটা সিঁড়ির ধাপ। জোর-ধাক্কায় দু'পাট দরজা খুলে গেল। কী-বোর্ডের সামনে দাঁড়ানো প্রহরী অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে ওদের দিকে। হাতের ব্রেনগানটা সোজা রানার বুকের দিকে ধরা।

'ওটার মুখটা অন্য দিকে সরাও, উল্লুক!' গর্জে উঠল রানা। 'ব্রিগেডিয়ার কোথায়? জলদি বল, গর্দভ! ভয়ানক ব্যাপার!'

'বিগ্…বিগ্…ব্রিগেডিয়ার নেই। ও…ও…ও…ওরা সবাই, দুঃ…দুঃ…দু'মিনিট আগে বে…বেব…বেব…'

'কি বললে? বেরিয়ে গেছে?' চোখ পাকিয়ে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করল রানা।

'আগ্…আগ্ আজ্ঞে, হ্যাঁ। সঙ্গে আর স…স…'

চট্ করে প্রহরীর ঘাড়ের ওপর দিয়ে ওর পেছন দিকে চাইল রানা। তারপর বলল, 'তাহলে পেছনে কে?'

কৌশলটা বুঝতে পারল না তোতলা প্রহরী। পেছন ফিরে চাইল। পরমুহূর্তেই ঢলে পড়ল কানের পেছনে পিস্তলের বাঁটের প্রচণ্ড একটা আঘাত খেয়ে। কী-বোর্ডে ঝোলানো সব ক'টা চাবি খুলে নিয়ে পকেটে পুরল রানা। হাত-পা-মুখ বেঁধে টেনে এনে সিঁড়ির নিচে লুকিয়ে রাখল ওরা প্রহরীর জ্ঞানহীন দেহ, তারপর ছুটল আবার রাস্তার মাঝখান দিয়ে।

কামান চারটের কাছে পৌঁছতে আরও একটা বাধা আছে। কয়জন গার্ড থাকবে কে জানে। দু'জনের হাতের শক্তিশালী টর্চ জ্বলে উঠল। দৌড়ানোর সাথে সাথে লাফালাফি করছে টর্চের আলো। দূর থেকে যে-ই দেখুক বুঝবে দু'জন লোক ছুটে আসছে কামান ঘরের দিকে, আত্মগোপন করার কোনও রকম চেষ্টা নেই ওদের মধ্যে- কাজেই সন্দেহের কিছু নেই।

ম্যাগাজিন গেটের কাছাকাছি আসতেই রানার চোখে পড়ল দু'জন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মত। পিস্তলটা বের করল রানা। টর্চটা বাম হাতে চলে গেছে ওর। এগিয়ে এল উদগ্রীব উদ্বিগ্ন প্রহরী দু'জন। চারদিকে হট্টগোল শুনতে পাচ্ছে ওরা কেবল, ব্যাপার কি বুঝতে পারছে না।

'তোমরা সব ঠিক আছ তো?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল রানা। 'কেউ এসেছিল এখানে? বোবা বনে গেলে কেন, জলদি বলো!'

'কেউ আসেনি তো! আমরা ঠিকই আছি। এত গোলাগুলির আওয়াজ কিসের?' জিজ্ঞেস করল একজন শিরস্ত্রাণ পরা প্রহরী।

'ওই পাকিস্তানী কুত্তাগুলো। গেটের গার্ড দু'জনকে খুন করে ঢুকে

পড়েছে দুর্গের ভেতর। ঠিক বলছ তো কেউ আসেনি এখানে? দাঁড়াও, আমি নিজে চেক করে দেখি।' টর্চটা ঘুরিয়ে প্রকাণ্ড স্টীলের দরজার তালা দেখল রানা পরীক্ষা করে। আশেপাশে দেখল, কেউ কোথাও নেই। 'যাক বাঁচা গেল। সাবধানে থেকো তোমরা।' চট করে টর্চের তীব্র আলোটা একবার প্রহীর চোখের ওপর ফেলে ওর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েই নিভিয়ে দিল রানা। পরমুহূর্তে ঢলে পড়ল প্রহরী জুলফির কাছে পিস্তলের বাঁটের একটা ভয়ঙ্কর আঘাত খেয়ে। খট্ করে আরেকটা শব্দ হলো পাশেই। দ্বিতীয় প্রহরীটাও পড়ল প্রথম জনের ওপর।

'বেঁধে ফেল ওদের, মিশ্রী। আমি তালাটা খুলছি।'

পঞ্চম চাবিটা লাগল। প্রকাণ্ড স্টীলের দরজা খুলে গেল নিঃশব্দে। দূরে আলতাফের মেশিনগানের শব্দ শোনা যাচ্ছে। গেটের কাছ থেকে একটা ট্রাকের এঞ্জিনের শব্দ এল- শেষ ট্রাকটাও বোধহয় বেরিয়ে গেল দুর্গ থেকে।

মিশ্রী খানকে জ্ঞানহীন দেহ দুটো ভেতরে টেনে এনে দরজা লাগিয়ে ওপরে উঠবার আদেশ দিয়ে এগিয়ে গেল রানা। খাড়া একটা স্টীলের মই বেয়ে উঠে এল সে কামান বসানো গুহায়।

সাবধানে এগোল রানা। ম্যান-ট্র্যাপ থাকতে পারে। এখন প্রথম কাজ ভেতরে আরও কোনও গার্ড আছে কিনা দেখে নেয়া, দ্বিতীয় কাজ এখান থেকে বেরোবার বন্দোবস্ত ঠিক রাখা। সব কাজ দ্রুত সারতে হবে, কিন্তু তাড়াহুড়ো করলে চলবে না।

চারদিকে টর্চের আলো ফেলে বুঝল রানা স্বাভাবিক গুহাকে কেটে আরও বড় করে নেয়া হয়েছে কাজের সুবিধার জন্যে। শত শত টন শক্তিশালী এক্সপ্লোসিভ আর অসংখ্য কামানের শেল থরে থরে সাজানো। এগিয়ে গেল রানা সামনে। বিশ গজ গিয়েই গুহাটা বাঁয়ে মোড় নিয়েছে। ঘুরেই চোখ পড়ল গুহামুখে বসানো বিশাল চারটে কামানের ওপর। অন্ধকারে যেন খাপ পেতে বসে অপেক্ষা করছে কারও জন্যে চারটে ভয়ঙ্কর দৈত্য। টর্চ নিভিয়ে দিল রানা। বোঝা গেছে কেউ নেই আর। এখন টর্চ জ্বালা থাকলে কারও চোখে পড়তে পারে গুহামুখের এই আলো।

কাছে গিয়ে একটা কামান স্পর্শ করে দেখল রানা। স্বপ্ন দেখছে, না সত্যি সত্যিই এসে গেছে সে? যেগুলো ধ্বংস করতে এতদূর এসেছে সে ঢাকা থেকে, সত্যিই কি সে এত কাছে এসে পৌঁছেচে সেগুলোর? কেমন যেন অবাস্তব লাগল ওর কাছে সবকিছু। নিঃশব্দে অন্ধকারের দিকে চেয়ে বসে আছে মস্ত চারটে কামান। কমপক্ষে বারো ইঞ্চি বোর হবে। এ যেন অন্য জগতের অবাস্তব কোনও জিনিস।

হঠাৎ চমকে উঠল রানা। কিসের যেন শব্দ হলো? কান পেতে রইল সে কিছুক্ষণ। নাহ, কোনও শব্দ নেই। বুঝল শব্দ নয়, শব্দের অভাবই ওকে চমকে দিয়ে ফিরিয়ে এনেছে বাস্তবে। চারদিক নিস্তব্ধ। আলতাফের গুলির

শব্দ শোনা যাচ্ছে না আর।

আলতাফ মারা গিয়ে থাকুক আর গুলি চালনা বন্ধই করে থাকুক, সময় ফুরিয়ে আসছে। আর অল্পক্ষণেই টের পেয়ে যাবে ভারতীয়রা যে বোকা বানানো হয়েছে ওদের। ছুটে আসবে ওরা এখানে। দ্রুত সারতে হবে সব কাজ। প্রথম, পালাবার ব্যবস্থা।

এগিয়ে গিয়ে রেলিং-এর ধারে বসে পড়ল রানা। ব্যাগ খুলে বের করল লম্বা রশি। গুহামুখের ডানধারে চলে গেল রানা। রশির একমাথা শক্ত করে বাঁধল রেলিং-এর সঙ্গে। রেলিংটা ঝাঁকিয়ে দেখল ওর ভার সহ্য করতে পারবে কিনা। বুঝল পারবে। নামিয়ে দিল রশিটা নিচে। রেলিং টপকে সামনের দিকে ঝুঁকে চারদিকে দৃষ্টি বুলাল রানা একবার।

নিচে শোনা যাচ্ছে সমুদ্রের গর্জন। কামানগুলো থেকে সোয়াশো ফুট নিচে। ডান পাশে দুর্গ প্রাচীর এসে মিশেছে পাহাড়ের গায়ে। অফিসারস্ কোয়ার্টারের ছাত আবছা দেখা যাচ্ছে তিরিশ ফুট নিচে গজ পনেরো দূরে। দ্বারোকা শহরটা দেখা যাচ্ছে আবছা মত। ফিরে এল সে মিশ্রী খানের সাথে দু'একটা কথা সেরে নিতে।

ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে ফিউজ, ডিটোনেটার, এক্সপ্লোসিভ আর সরু তামার তার ঘাঁটাঘাঁটি করছে মিশ্রী খান। রানাকে আসতে দেখে চোখ তুলল।

'এই বোমাগুলোর মধ্যেই ব্যবস্থা করি, কি বলেন, ওস্তাদ?' কয়েক সারি বাক্সের দিকে বুড়ো আঙুল দিয়ে দেখাল মিশ্রী খান। ক্লক ওয়ার্ক ফিউজের কাঁটা ঠিক করে ফেলেছে সে।

'যেখানে খুশি রাখো। শুধু লক্ষ রেখো, সহজেই যেন খুঁজে বের করতে না পারে। ওদের তো জানবার কথা নয় যে আমরা বুঝে ফেলেছি যে আমাদের ফিউজগুলো নষ্ট করে দেয়া হয়েছে, তাই না?'

'ঠিক, ওস্তাদ। ওরা যদি কোনও ক্রমে খুঁজে বের করতে পারত আমাদের বসানো বোমা তাহলে হেসে খুন হয়ে যেত। কিন্তু হাসিয়ে নয়, বোমা মেরে খুন করতে চাই। তাই ভাল করে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছি। কিন্তু ব্যাটারি?'

'আনছি। তুমি নিচের দরজা ঠিকমত তালা দিয়েছ তো?'

'বিলকুল। এ সব ব্যাপারে আমার...'

কথাটা শেষ হলো না। হঠাৎ করে একটা জোর ধাতব শব্দ হলো নিচে। গমগম করতে থাকল শব্দটা গুহার মধ্যে। চমকে দু'জন চাইল দু'জনের দিকে। আবার ভেসে এল শব্দ, আবার, আবার।

'এসে গেছে ওরা। হাতুড়ি নিয়ে এসেছে। পিটাচ্ছে স্টীলের দরজা ভাঙবার জন্যে,' ফিসফিস করে বলল রানা। বলেই ছুটল কামানগুলোর দিকে। মিশ্রীও ছুটল পেছন পেছন।

'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ওরা টের পেল কি করে যে আমরা ঢুকে পড়েছি

এর মধ্যে?' প্রশ্ন করল মিশ্রী খান ছুটতে ছুটতে।

'নাজির বেগ!' কর্কশ শোনাল রানার গলাটা। 'দুর্গের সব কথাই বলেছিল সে আমাদের, কেবল নিচের দরজা খোলার সাথে সাথে যে গার্ডরুমে অ্যালার্ম বেল বেজে ওঠে সেই কথাটা চেপে গিয়েছিল।'

পনেরো

গুণে গুণে ষাট ফুট নামল রানা রশি বেয়ে। দাঁতে কামড়ে ধরে আছে সে ইশরাতের দেয়া এক মাথায় হুক বাঁধা কঞ্চিটা। রশিতে দুইবার থাবড়া দিয়ে ইঙ্গিত করল সে মিশ্রী খানকে। দোলাতে আরম্ভ করল মিশ্রী খান রশিটা রেলিং-এর ধারে শুয়ে পড়ে। রশি ধরে ঝুলে থেকে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলতে আরম্ভ করল রানা। ধীরে ধীরে বেড়ে চলল গতি, সেই সাথে ঝুলনের দূরত্ব। ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে রানা অফিসারস্ কোয়ার্টারের দিকে। ইশরাত ছুঁড়ে দেবে একটা রশি। যে করেই হোক ধরতে হবে রানাকে সেই রশি। এরই ওপর নির্ভর করছে এখন সবকিছু।

দাঁতে দাঁত চেপে দু'হাতে ধরে আছে রানা দড়ির শেষ প্রান্ত। কিছু দেখা যাচ্ছে না। আবার চেপে এসেছে বৃষ্টি। প্রথম দিকে পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আসা একটা পাথরে বার তিনেক ঠোকর খেয়েছিল রানা, কায়দা করে সরে গেছিল সে। তখন গতি কম ছিল বলে ধাক্কাটা বিশেষ আমল দেয়নি। কিন্তু হঠাৎ খেয়াল করল ধীরে ধীরে আবার ফিরে আসছে সে পাথরটার দিকে। সর্বনাশ! এবার একবার বাড়ি খেলে ছাতু হয়ে যাবে সে। অন্ধকারে ঠিক দেখা যাচ্ছে না কিছু। আর কতদূরে আছে পাথরটা? এইবারেই কি ধাক্কা খেতে যাচ্ছে সে? বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল রানার। প্রতিবার যখনই ওদিকে যাচ্ছে, পাগলের মত হুক লাগানো কঞ্চিটা দিয়ে খুঁজছে সে ইশরাতের ছুঁড়ে দেয়া রশি। আর প্রতিবারেই যখন বিফল হয়ে ফিরে আসছে, চোখ বুজে দম বন্ধ করে প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রচণ্ড এক ধাক্কার জন্যে। পাথরটার কথা ভুলে যাবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু কিছুতেই আতঙ্ক গেল না মন থেকে। এই গতিতে ধাক্কা খাওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু। ক্রমে কাছে এগিয়ে আসছে ওর মৃত্যু।

কিন্তু কি হয়েছে ইশরাতের? রশি কোথায়? ধরা পড়ে গেল না তো! হাত দুটো ব্যথা হয়ে গেছে রানার ঝুলে থাকতে থাকতে। আর কতক্ষণ সে পারবে এভাবে ঝুলে থাকতে? আবার সাঁ করে পার হয়ে গেল সে পাথরের দুই ফুট দূর দিয়ে। ঝিক্ করে একবার বিদ্যুৎ চমকে উঠতেই পরিষ্কার দেখতে পেল রানা পাথরটা। এই-ই শেষ চেষ্টা- বুঝল রানা পরিষ্কার। এবার রশি না পেলে ওর নিশ্চিত মৃত্যু ঠেকাতে পারবে না কেউ। প্রচণ্ড আঘাতের

কথা চিন্তা করে গাল দুটো কুঁচকে গেল ওর একবার।

কঞ্চিটা বাড়াল রানা সামনের অন্ধকারে, এদিক ওদিক হাতড়াল, কিছু নেই। খোদা! হঠাৎ লাফিয়ে উঠল রানার হৃৎপিণ্ড। পেয়েছে সে রশিটা!

একটানে কাছে নিয়ে এল রানা রশিটা। শক্ত করে চেপে ধরে কমিয়ে ফেলল গতি। ধীরে ধীরে এসে ঠেকল ওর দেহটা পাথরে, ওটা পার হয়ে চলে গেল আরও ছয় সাত ফুট। ইশরাতের রশিটা কোমরে বেঁধে নিয়ে ভেজা রশি বেয়ে ধীরে ধীরে উঠে এল সে ওপরে। রেলিং পার হয়েই শুয়ে পড়ল মেঝের ওপর। হাপরের মত শ্বাস পড়ছে ওর তখন।

বিনা বাক্য ব্যয়ে ওর কোমর থেকে খুলে নিল মিশ্রী খান ইশরাতের পাঠানো রশিটা। লম্বা রশির দু'মাথাই রয়েছে ইশরাতের কাছে। এখন শক্ত মসৃণ কোনও একটা জিনিস দরকার যেটা পুলির কাজ করবে। একটা কামানের গায়ে পরিয়ে দিল মিশ্রী খান রশিটা, দুটো টান দিল রশি ধরে। ওদিকে ছাতের ওপর ওয়াটার ট্যাঙ্কে পানি তোলার একটা মোটা পাইপের ওপাশে টেনে গিঁট দিয়েছে ইশরাত রশির দুই মাথা।

দুই মিনিটে চলে এল ভারি ব্যাটারিটা রশিতে ঝুলতে ঝুলতে। আর দু'মিনিটে নাইট্রো, প্রাইমার এবং ডিটোনেটারের ক্যানভাস ব্যাগ পৌঁছে গেল ওপরে। এমনি সময় থেমে গেল হাতুড়ির ঘা। তড়াক করে উঠে বসল রানা। থামল কেন হাতুড়ি-পেটা? ভেঙে ফেলল ওরা দরজা? অটোমেটিক কারবাইন হাতে ঢুকে পড়েছে ভারতীয় সৈন্য?

উঠে দাঁড়াল রানা। কাঁধে তুলে নিল মিশ্রী খান ব্যাটারিটা। এখন আর কিছু চিন্তা করবার অবসর নেই। ওরা মরুক বাঁচুক, কাজটা সমাধা হওয়াই আসল কথা।

গুহার মধ্যে একটি প্রাণীও দেখতে পেল না ওরা। টর্চ ধরল রানা দরজার দিকে। যেমন ছিল তেমনই আছে সেটা। অটল, অনড়। মিশ্রী খানকে নিজের কাজ করবার হুকুম দিয়ে নেমে গেল রানা মই বেয়ে। দরজার বাইরে কারা যেন কথা বলছে। কি বলছে শুনবার জন্যে দরজায় কান লাগাতে গিয়ে চমকে উঠল রানা। অসম্ভব গরম দরজাটা। সোঁ সোঁ একটা শব্দ আসছে বাইরে থেকে। টর্চ নিভাতেই দেখতে পেল তালার কাছটায় লাল হয়ে উঠছে দরজাটা। অক্সি-অ্যাসেটিলিন টর্চ দিয়ে তালা গলাবার চেষ্টা করছে ওরা এখন। দরজাটা আর্মার্ড স্টীলের তৈরি- গলতে দেরি আছে, বুঝল রানা। এখনও অন্তত সাত মিনিট সময় আছে ওদের হাতে। উঠে এল রানা ওপরে। মিশ্রী খানকে বলল ব্যাপারটা।

'কিচ্ছু ভাববেন না, ওস্তাদ। পাঁচ মিনিটের কাজ। ওরা পৌঁছবার দুই মিনিট আগেই কেটে পড়ব আমরা এখান থেকে।'

ঠিক পাঁচ মিনিটেই কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়াল মিশ্রী খান। টর্চ জ্বেলে এপাশ ওপাশ থেকে ভাল করে দেখল কিছু দেখা যাচ্ছে কিনা। তারপর

সন্তুষ্টচিত্তে একটা বক সিগারেট ধরিয়ে বেসুরো শিস দিতে আরম্ভ করল।

'হয়ে গেছে, মিশ্রী খান?' ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, ওস্তাদ। যে-কাজে এসেছিলাম সে-কাজ শেষ। ঠিক রাত বারোটায় সেট করে দিলাম। ওদের বাপেরও ক্ষমতা নেই এখন এটাকে বন্ধ করে। কেউ স্পর্শ না করলে বারোটায় ফাটবে- কিন্তু যদি তার আগেই কেউ ধরে তবে সঙ্গে সঙ্গে ফাটবে। এখন দেখা যাক পৈত্রিক প্রাণটা নিয়ে দেশে ফেরা যায় কিনা। আবার কি সমুদ্র দিয়ে যেতে হবে, ওস্তাদ?'

রানা কোনও জবাব দিল না। দরজায় বেশ খানিকটা ফুটো করে ফেলেছে ওরা। দ্রুত চলে এল ওরা গুহামুখের কাছে। একে একে চলে গেল অফিসারস্ কোয়ার্টারের ছাতে। রশিটা ছুরি দিয়ে কেটে একদিক ধরে টেনে সরিয়ে আনল কামানের ওপর থেকে। ব্যস। কাজ শেষ ওদের।

রাত বারোটা বাজতে দশ।

ইশরাতের দ্বিতীয় আস্তানার বারান্দায় বসে আছে রানা। পাল্লা দিয়ে নাক ডাকাচ্ছে আলতাফ আর মিশ্রী খান গেস্টরুমে পাশাপাশি দুটো খাটে শুয়ে। রাত সোয়া বারোটায় আসবে পাকিস্তানী সাবমেরিন থেকে রেসকিউ বোট।

স্নান সেরে পরিষ্কার শুকনো কাপড় পরে বেশ ঝরঝরে লাগছে শরীরটা। বারান্দায় একটা আরাম কেদারায় আরাম করে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে রানা। ব্রেনগানটা পাশেই মাটিতে রাখা। নিজেই যেচে পাহারার ভার নিয়েছে সে।

বৃষ্টি থেমে গেছে বেশ অনেকক্ষণ হয়। পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আকাশটা। সাদা মেঘের ফাঁক দিয়ে এক-আধবার উঁকি দিয়েই আবার গা ঢাকা দিচ্ছে চাঁদ। দশ হাত দূরে আরব সাগরের ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে তীরে। ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা। শহরটা নিস্তব্ধ। চারদিকে একটা শান্ত সমাহিত ভাব। রানার মনের মধ্যেও কোনও উদ্বেগ নেই। কাজ ফুরিয়েছে। যে-কাজে পাঠানো হয়েছিল ওদের, সেটা সুসম্পন্ন হয়েছে। অদ্ভুত এক নির্মল আনন্দে ভরে আছে হৃদয়। কান পেতে শুনছে সে সমুদ্রের কল্লোলধ্বনি আর তরঙ্গের উচ্ছ্বাস।

রানার চুলের মধ্যে প্রবেশ করল ইশরাত জাহানের নরম আঙুল। নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সে।

'কি ভাবছ, মেজর?'

'কিচ্ছু না। বসে বসে পাহারা দিচ্ছি।'

'এখানে কে আসবে যে পাহারা দিচ্ছ? দু'ঘণ্টা আগেই একবার সার্চ করে গেছে। আগামী বারো ঘণ্টার মধ্যে এখানে খোঁজ করবার কথা কারও মাথায় আসবে না।'

'তবু, সাবধানের মার নেই। তাছাড়া বসে থাকতে ভালই তো লাগছে।'

'কফি খাবে এক কাপ? পানি চড়িয়ে দিয়েছি স্টোভে।' একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল ইশরাত।

'ব্যাপার কি, জাহান?' অবাক হয়ে গেল রানা। 'শাড়ি পরেছ যে?'

হাসল ইশরাত। ঝকঝক করে উঠল সুন্দর দু'পাটি দাঁত। বলল, স্পাকিস্তানেই যখন যেতে হচ্ছে তখন ছদ্মবেশের আর কি দরকার?'

খুঁটিয়ে দেখল একবার রানা ইশরাতকে। কপালে লাল টিপ পরেছে সে, কানে ছোট্ট দুটো ঝুমকো। ডান হাতে কয়েকগাছি সোনার চুড়ি, বাঁ হাতে একটা লেডিস্ ঘড়ি কালো ব্যাণ্ড দিয়ে বাঁধা। লম্বা নখে নেইল পলিশ। আঁটসাঁট করে পেঁচিয়ে পরেছে সে একটা কমলা রঙের শিফন শাড়ি। মাথার চুল পুরুষের মত করে ছাঁটা। শাড়ি ব্লাউজের সঙ্গে চুলের এই অসামঞ্জস্য বিদঘুটে দেখালেও কেন জানি ভাল লাগল রানার।

'খারাপ লাগছে দেখতে?' জিজ্ঞেস করল ইশরাত।

'অপূর্ব লাগছে।'

'কফি খাওয়াবার কথা শুনে বলছ, না সত্যিই?'

'সত্যি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

চুপচাপ সাগরের গান শুনল কিছুক্ষণ ইশরাত, তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, 'আর কতক্ষণ, রানা?'

ঘড়ি দেখে জবাব দিল রানা, 'তিন মিনিট।'

অস্থির পায়ে চলে গেল ইশরাত কফি আনতে। দুই মিনিট পর রানার হাতে কফির কাপ ধরিয়ে দিয়ে জানতে চাইল ইশরাত, 'আর আছে এক মিনিট। ওদের জাগাবে না?'

'কি দরকার? ঘুমাচ্ছে ঘুমাক। ভয়ানক খাটুনি গেছে ওদের ওপর দিয়ে।' কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'বাহ, দারুণ হয়েছে তো!'

ঘড়ির ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না ইশরাত।

ঠিক বারোটায় কেঁপে উঠল রানার হাতে ধরা কাপ। প্রথমবার মৃদু, দুই সেকেণ্ড পর প্রচণ্ডভাবে দুলে উঠল গোটা এলাকা- তারপর পৌঁছল এসে বিস্ফোরণের আওয়াজ।

মৃদু হাসি ফুটল রানার মুখে।

* * * *